যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে পর্ব-১

==================

===============================

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
أما بعد...

অনেকেই মনে করেন, 'ইসলাম কোন মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয় না। যত অপরাধই করুক, তাকে হত্যা করা যাবে না। ইসলাম যেখানে একটা পিঁপড়াকে কষ্ট দেয়ারও অনুমতি দেয় না, সেখানে কালিমার দাবিদার একজন মুসলমানকে কিভাবে হত্যা করা যাবে!!'
ফরিদ মাসউদদের মতো দালালদের বিকৃতি আর প্রোপাগাণ্ডার কারণে ইদানিং এ ধরণের ধ্যান-ধারণা অনেক ছড়িয়েছে। এ কারণে মুজাহিদরা কোন নাস্তিক, মুরতাদ বা জুলহাজ মান্নানের মতো কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করলে কারো কারো মনে সংশয় জাগে, এ হত্যা কিভাবে জায়েয হল? জিহাদিরা

হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। এরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। এরা নির্দয়। এরা হিংস্র। এরা রক্তপিপাসু- ইত্যাদি।

আর যারা মোটামুটি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের অনেকের ধারণা- ইসলাম কেবল তিন শ্রেণীর মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয়:

১. যে মুসলমান ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে।

২. বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা।

৩. দ্বীন ত্যাগী মুরতাদ।

তাদের ধারণা, এর বাহিরে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। যেমন এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة.

"যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।"

(সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

এ হাদিসের কারণে তারা মনে করেন, উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়।

আর এই তিন শ্রেণীর হত্যার ব্যাপারেও তাদের অনেকের আকীদা- তা ইমাম ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। তাই, মুজাহিদরা যখন কোন মুরতাদকে হত্যা করেন, তখন তাদের সংশয় লাগে, কিভাবে তা জায়েয হলো! এর প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন অশোভন মন্তব্যও করে থাকেন।

এখানে তারা দুটো ভুল করেছেন-

এক.

হত্যাকে এই সুনির্দিষ্ট তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; অথচ বাস্তবে হত্যার গণ্ডি আরো অনেক ব্যাপক। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة. اهـ

"আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত যে, হত্যার সবব- দশটি।" (তাফসীরে কুরতুবী: ৭/১১৮)

অর্থাৎ এই দশ সববের কোন একটা কোন মুসলিমের মাঝে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে।

হাদিসের জওয়াব

উপরোক্ত হাদিসে যে হত্যার সবব তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, এর জওয়াব- হাদিসে মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর শাখা-প্রশাখা দশ (এমনকি দশেরও বেশি) পর্যান্ত পৌঁছায়। অর্থাৎ উপরোক্ত তিন সবব হলো মৌলিক তিনটি সবব, যার ভেতরে আরো অনেক সবব প্রবিষ্ট হয়ে আছে। যেমন- হাদিসে হত্যার একটি সবব বলা হয়েছে 'কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা।' কিন্তু কোন মুসলমানের হত্যায় যদি অনেকে শরীক থাকে, যাদের কেউ সরাসরি হত্যায় (যেমন- যবাই করা বা গুলী করায়) অংশ নিয়েছে, আর কেউ কেউ পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল- তাহলে এই একজন মুসলমানের জানের বদলায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই হত্যা করা হবে। যারা সরাসরি যবাই বা গুলী করেছে তাদেরকে যেমন হত্যা করা হবে, যারা পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল তাদেরকেও হত্যা করা হবে। কারণ, তাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

তাই সকলকেই হত্যা করা হবে। পাহাড়াদারদের হত্যার কথাটা এ হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে হাদিসের ব্যাপকতার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যান্য হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আছার থেকে সেটা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে আলাচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

দুই.

দ্বিতীয় যে ভুলটি তারা করেছেন, তা হলো- সকল শ্রেণীর হত্যার জন্য ইমামের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অথচ মুরতাদ (এবং আরো অনেকের) হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়, বরং যে কোন মুসলমানই তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। যেমন- কোন পিতা তরবারি নিয়ে তার পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করছে। পিতাকে হত্যা করা ব্যতীত তার হাত থেকে রক্ষার কোন পথ নেই। এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা হল- উক্ত পুত্র তার পিতাকে হত্যা করে দেবে। এ হত্যা নিজের জান রক্ষার জন্য। যেমন- হিদায়াতে বলা হয়েছে,

لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقلته يقتله. اهـ

"মুসলিম পিতা যদি তার পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করে, আর হত্যা ব্যতীত তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে (উক্ত পুত্র তার পিতাকে) হত্যা করে দেবে।" (হিদায়া:

১/৩৭৯)

দেখুন- এখানে কিন্তু পিতাকে হত্যার জন্য ইমামের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কোন মুসলমানকে হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়। ইমাম বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ইমামের অনুমতিও শর্ত নয়। দারুল ইসলাম থাকাও শর্ত নয়। দারুল ইসলামের বাসিন্দা হওয়াও শর্ত নয়। কাজেই, যে কোন ধরণের হত্যার জন্য ইমাম কিংবা দারুল ইসলামের শর্ত করা নিতান্তই ভুল।

পরিস্থিতির বিবেচনায় বিষয়টা একটু আলোচনা করে দিলে অনেকেরই উপকারে আসবে মনে হল। তাই আল্লাহর নামে শুরু করলাম। বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে নেই। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুতেই ক্ষান্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-২

لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث- হাদিস নিয়ে কিছু কথা

এ হাদিস থেকে অনেকেই সংশয়ে পড়েছেন যে, তিন শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা বৈধ নয়। অথচ বাস্তবে এদের বাইরে আরো অনেককে শরীয়ত হত্যার বৈধতা দিয়ে রেখেছে। এ হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইম্মায়ে কেরাম তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিকভাবে এ হাদিসের সাথে ঐসব হত্যার যে বিরোধ দেখা যায়, তাও তারা নিরসন করেছেন। উপরে এ ব্যাপারে কিঞ্চিত ইশারা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টাকে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬হি.) বলেন,

قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع. اهـ

"আইম্মায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক এমন মুসলিম, যে বিদআত বা (ইমামের বিরুদ্ধে) বাগাওয়াত (তথা বিদ্রোহে) লিপ্ত হয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে মুসলিম জামাআত থেকে বের হয়ে যায়, তার উপরও এ (হত্যার) বিধান প্রযোজ্য। তদ্রূপ খাওয়ারেজরাও এ বিধানের আওতাভুক্ত- ওয়াল্লাহু আ'লাম। শোন, (জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর) আক্রমণকারীসহ এ জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তি এ হাদিসের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত। কাজেই অনিষ্ট প্রতিহত করণার্থে এদেরকে হত্যা করা যাবে।" (শরহু মুসলিম লিন-নববী: ১১/১৬৫)

এ বক্তব্যে ইমাম নববী রহ. এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলিমের কথা উল্লেখ

করেছেন, যাদেরকে হত্যা করা বৈধ-

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

এ ছাড়াও আরো অনেকে যাদের তিনি নাম নেননি, শুধু ইশারা করে গেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) ইমাম আবু হাফস কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৫৬হি.) থেকে বর্ণনা করেন-

يلتحق به من خرج عن جماعة المسلمين وان لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. اهـ

“দ্বীনত্যাগীর বিধান প্রযোজ্য হবে এমন সব মুসলিমের উপরও, যারা মুরতাদ তো হয়নি কিন্তু মুসলিমদের জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। যেমন- এমন মুসলিম, যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর

তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যেমন- (শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী) বাগী, ডাকাত, যুদ্ধে লিপ্ত খাওয়ারেজ এবং এ জাতীয় অন্যান্য মুসলমান।" (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

এখানে হত্যাপোযুক্ত আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল-

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর উক্ত হদ কায়েম করা সম্ভব নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

এ ছাড়াও আরোও অনেকে।

ইবনে হাজার রহ. আরোও বলেন-

حكى بن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض} قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الارض.

قال: ورد في القتل بغير الثلاث أشياء، منها:

- قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي}
- وحديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه)
- وحديث (من اتى بهيمة فاقتلوه)
- وحديث (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه)
- وقول عمر (تغرة أن يقتلا)
- قول جماعة من الائمة: إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا
- وقول جماعة من الائمة: يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت
- وقول جماعة من الائمة: يقتل تارك الصلاة.

قال: وهذا كله زائد على الثلاثة.

قلت: وزاد غيره قتل:

- من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق
- ومانع الزكاة المفروضة
- ومن ارتد ولم يفارق الجماعة
- ومن خالف الاجماع وأظهر الشقاق والخلاف
- والزنديق إذا تاب على رأي
- والساحر. اهـ

“ইবনুত-ত্বীন রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এ হাদিসটি আয়াতে মুহারাবা দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আয়াতে মুহারাবা হলো-

{من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض}

“কাউকে হত্যা করা কিংবা যমিনে ফাসাদ-অশান্তি বিস্তার করা ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, (সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল)।” (মায়েদা: ৩২)

তিনি বলেন, (এ আয়াতে) শুধু যমিনে ফাসাদ বিস্তার করার কারণেই হত্যার বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি আরোও বলেন, হাদিসে উল্লিখিত তিন কারণ ছাড়াও হত্যার বৈধতা সম্বলিত আরোও বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন আয়াত-হাদিসে এসেছে। যেমন-

- আল্লাহ তাআলার বাণী: {فقاتلوا التي تبغي} ‘(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিক ফিরে আসে।)’ (হুজুরাত: ৯)

- হাদিস: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه) ‘কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ

সমকামিতা) করতে দেখলে তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من اتى بهيمة فاقتلوه) ‘যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه) ‘লোকজন কোন এক ইমামের বাইয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ বিদ্রোহ করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।

- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য: (تغرة أن يقتلا) ‘(মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কেউ কারো হাতে বাইয়াত হয়ে গেলে, তাকেও বাইয়াত দেয়া যাবে না, সে যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাকেও না। কারণ,) হতে পারে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।’

- আইম্মায়ে কেরামের এক দল বলেন: কদরিয়্যা ফেরকা তওবা করলে তো ভাল, অন্যথায় তাদের হত্যা করে দেয়া হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: বিদআতিদেরকে মারতেই থাকা হবে; হয়তো তাওবা করবে, নয়তো মার খেতে খেতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: নামাযত্যাগীকে হত্যা করে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, এ সবগুলোই হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বাইরে।

আমি বলি, অন্যরা আরো কয়েকটি বাড়িয়েছেন:

- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো মাল বা ইজ্জতের উপর হামলা করবে।

- ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

- যে মুরতাদ হয়ে গেছে, কিন্তু মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়নি।

- যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

- এক মত অনুযায়ী: যিনদ্বীক, যখন সে তাওবা করে।

- যাদুকর।” (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৬)

এ বক্তব্য থেকে আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান হত্যার বৈধতা পাওয়া গেল:

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় যে বাইয়াত দিয়েছে এবং যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

অতএব, উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আইম্মায়ে কেরামে বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত ১৮ শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল, যাদেরকে হত্যা করার বৈধতা শরীয়ত দিয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত হাদিসে এদের কারোরই উল্লেখ নেই:

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর তা কায়েম করা সম্ভব নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় এদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

সতর্কতা: *এদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা বৈধ নয়। বিশেষ*

পরিস্থিতিতে, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে বৈধ, অন্যথায় নয়। সামনে পৃথক পৃথক এদের সকলের আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। তখন আশাকরি পরিষ্কার হবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-৩

হাদিসের সমন্বয়

আমরা দেখলাম, শরীয়ত উক্ত তিন শ্রেণী ছাড়াও আরো অনেক মুসলমানকে হত্যার বৈধতা দিয়েছে; এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত হাদিসে শুধু তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হল কিভাবে?

এর নিরসন বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন-

১. কেউ বলেছেন, এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে। যেমন- ইবনে

হাজার রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে মুহারাবা দ্বারা এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে।

২. কেউ বলেন, এ হাদিসের বাইরে অন্য যত হত্যার কথা এসেছে, সেগুলোকে এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর কোন না কোন একটা মধ্যে ফেলা যায়। যেমন- সমকামিতা এবং পশুসঙ্গমকে যিনার শ্রেণীতে ফেলা যায়। খাওয়ারেজ ও বাগীদেরকে দ্বীনত্যাগী শ্রেণীতে ফেলা যায়। এভাবে সবগুলোকেই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়। অতএব, মৌলিক কারণ তিনটিই, তবে তার শাখা-প্রশাখা অনেক।

৩. তবে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বুঝে আসছে হাফেয ইবনে হাজার রহ. যে নিরসন পেশ করেছেন- সেটি। তা হল- হাদিসে যে তিন শ্রেণীর হত্যার কথা এসেছে (অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকারী, বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা, মুরতাদ) তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা ফরয। চাই এরা কারোও অনিষ্ট সাধন করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করতে। এই তিন ব্যক্তি এমন যে, এদের ব্যক্তিত্বটাই হত্যার যোগ্য। তারা কি অন্য কোন অনিষ্ট করল কি করল না- তা দেখার বিষয়

নয়। যিনা, হত্যা ও ইরতিদাদ এমন অপরাধ, যাতে লিপ্ত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকার যোগ্য থাকে না। উক্ত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর সে অন্য কোন অপরাধ না করলেও তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে বাকি ১৮ শ্রেণী, যাদের হত্যার কথা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে এসেছে- তাদেরকে হত্যা করতে হয় তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে। এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। যেমন-

- বাগী যদি বিদ্রোহ ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- কারো জান, মাল বা ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়াই (ধমকি, চিৎকার বা প্রহারের দ্বারা) বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী যদি যাকাত আদায়ে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা হবে না।

বাকিগুলোরও একই কথা। হত্যা ছাড়াই যদি তাদের অনিষ্ট

দমন করা যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। কিন্তু ঐ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণী ব্যতিক্রম। এদের বিষয়টা অনিষ্ট দমনের সাথ সম্পর্কিত নয়, বরং এদের ব্যক্তিত্বটাই এমন যে, এরা আর বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। এদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

উদাহরণ

যেমন ধরুন, নামায এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য। একজনের নামায অন্যজন আদায় করলে হবে না। এক পরিবারের একজন বাকি সকলের নামায একাই পড়ে নিলে বাকিদের নামায আদায় হবে না। তাদের নামায তাদেরকেই আদায় করতে হবে। কিন্তু জিহাদ এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা অর্জন হয়ে যায়, তাহলে বাকিরা জিহাদ না করলেও চলবে। তবে নফিরে আম হয়ে গেলে তখন কথা ভিন্ন। তখন সকলকেই শরীক হতে হবে।

এখানেও বিষয়টা এমনই। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিত্বটাই পৃথিবীতে থাকার অনুপযুক্ত। তাই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর বাকিদের অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। আর হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না হলে হত্যা করা হবে। কাজেই, এ হাদিসের সাথে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের বিরোধ নেই। এ হাদিসে বিশেষ তিন শ্রেণীর কথা এসেছে আর অন্যান্য আয়াত ও হাদিসে অন্য প্রকারগুলোর কথা এসেছে। একটার সাথে আরেকটার কোন বিরোধ নেই।

এবার ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি সংক্ষেপ কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন-

والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينا أما من ذكرهم فان قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة. اهـ

“এর প্রকৃত জওয়াব হল- তিন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধের কথাটা এসেছে এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে, যাদের স্বয়ং ব্যক্তিটাকে হত্যা

করাই ফরয। পক্ষান্তরে অন্য যাদের কথা বলা হয়েছে- তাদের কাউকে তো হত্যা করা বৈধ হবে কেবল ঐ সময়, যখন তার সাথে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বেঁধে যায়। (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

বি.দ্র.

বিবাহিত যিনাকার (যদি গোলাম বা বান্দি না হয়; কেননা, তাদের হুকুম ভিন্ন) তাওবা করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

মুরতাদ যদি তাওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা ফরয। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

তবে অন্যায় হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অলী (অভিভাবকরা) মাফ করে দেয়, তাহলে মাফ পেয়ে যাবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে।

ইসলামে অস্ত্র প্রয়োগের গুরুত্ব

ইসলাম এমন ধর্ম, অস্ত্র যার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত এ দ্বীন যথাযথ প্রতিষ্ঠা বা সংরক্ষণ কোনটাই হতে পারে না। বিজাতীয় দুশমনকে প্রতিহত করা এবং ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যেমন অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়; মুসলমানদের পারস্পরিক শান্তি-শৃংখলা; জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাও তেমনি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিল করেছেন, সাথে যমিনে অস্ত্র তৈরির উপাদানও সৃষ্টি করেছেন, যাতে কিতাবে বর্ণিত হেদায়াত ও জীবন বিধানকে অস্ত্রের বলে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দ্বীন ও দ্বীনের বিধান মেনে চলা সকলের জন্য সম্ভব হয় না। আল্লাহর বিধান ছেড়ে বাঁক পথ ধরা অনেকেরই তবিয়ত। এদেরকে সোজা পথে চালাতে অস্ত্র

প্রয়োগের বিকল্প নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিলের পাশাপাশি যমিনে অস্ত্রের উপাদান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

"আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শন(মু'জিযা)সহ লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। আমি তাদের সাথে কিতাব নাযিল করেছি, নাযিল করেছি (আমার তরফ থেকে) এক ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীমশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।" (হাদিদ: ২৫)

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. اهـ

"(আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি) অর্থাৎ লৌহকে আমি এমন সব লোকের দমনকারী বানিয়েছি, যারা সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও হক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৮/২৭)

অতএব, অবাধ্যদেরকে বশীভূত করার জন্য অস্ত্র প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد . كتاب يهدي به، وحديد ينصره، كما قال تعالي ... اهـ

"দ্বীন কিছুতেই কায়েম হবে না কিতাব, মীযান (ন্যায়দণ্ড) এবং লোহা(র সমন্বয়) ব্যতীত। কিতাব থেকে হিদায়াত নেয়া হবে আর লোহা তাকে সাহায্য করবে; যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ...।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৬)

তিনি অন্যত্র বলেন,

قال تعالى: { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب} فمن عدل عن الكتاب قُوِّمَ بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نضرب بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف. اهـ

"আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে।' অতএব, যে কেউ কিতাব ছেড়ে বাঁকা পথ ধরবে, তাকে লৌহ প্রয়োগে সোজা করা হবে। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের মাধ্যম (দুটি): কুরআন ও তরবারি। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করেছেন, এই (কুরআন) ছেড়ে যে ভিন্ন পথ ধরবে, তাকে এই (তরবারি) দ্বারা আঘাত করতে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া:

২৮/২৬৪)

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله تعالى وبه ورد الأثر " إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن " . اهـ

“আল্লাহ তাআলার ভয়ের চেয়ে শাস্তির ভয়ে মানুষ নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকে বেশি । এ ব্যাপারেই এ আছারটি বর্ণিত আছে- ‘আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা যতটুকু শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন, সুলতানের দ্বারা এর চেয়ে বেশি করেন।” (শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৯১)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فی بعض فوائد العقوبات المشروعة فی الدنيا ضبط العوام كما قال عثمان بن عفان رضی الله عنه ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن فان من يكون من المنافقين والفجار فانه ينزجر بما يشاهده من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة واما فوائد الأمر والنهی

فأعظم من ان يحصيها خطاب أو كتاب بل هى الجامعة لكل خير يطلب ويراد وفى الخروج عنها كل شر وفساد. اهـ

"শরীয়ত নির্ধারিত কিছু কিছু দুনিয়াবি শাস্তির একটি ফায়েদা এই যে, সেগুলো দ্বারা জনসাধারণের মাঝে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হয়। যেমনটা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যতটুকু শান্তি-শৃংখলা আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন না, তার চেয়ে বেশি তিনি সুলতানের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন।' কেননা, মুনাফিক ও পাপাচারি লোকেরা শাস্তি দর্শনে বারণ হয় এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। এটি শরীয়ত নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় শাস্তির একটি উপকারী দিক। আর আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের উপকারের কথা তো কোন এক বয়ানে বা কিতাবে বুঝানো সম্ভব না। বরং প্রত্যাশিত সকল কল্যাণ এতেই নিহিত। আর তা পরিত্যাগ করাতেই সকল অনিষ্ট ও ফাসাদ।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৪১৬)

অতএব, যারা ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে বুলি আওড়ান; ইসলামে মারামারি নেই, কাটাকাটি নেই বলে মুখে ফেনা

তুলেন; দাওয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন- তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। আল্লাহ তাআলার চিরন্তন সুন্নাহ’র বিরোধি কথা বলেন। তারা কিছুতেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। উপরন্তু উম্মাহকে এক ভয়াবহ বিকৃতি, ফাসাদ ও পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৫

জনসাধারণ কি অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে?

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে একটা বিষয় বুঝে নেয়া চাই। তা হলো- (হুদুদ-কেসাস) ও (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)- এর মধ্যকার ব্যবধান। বিষয়টি বুঝার জন্য দু’টি উদাহরণ দিচ্ছি:

এক.

ধরুন একটা বাজারে কোন একটা সন্ত্রাসী একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করতে তার উপর চড়াও হয়েছে। সে ছুরি বের করে তাকে যবাই করে ফেলতে চাইছে। আশেপাশে যারা উপস্থিত আছে তাদের সামর্থ্য আছে উক্ত সন্ত্রাসীকে প্রতিহত করে নিরপরাধ লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার। হতে পারে উপস্থিত লোকদের ধমকিতে, কিংবা শারীরিক আঘাতে সে সরে যাবে। আবার এও হতে পারে- উক্ত সন্ত্রাসী সহজে দমতে চাইবে না। এমনও হতে পারে- অস্ত্র প্রয়োগ কিংবা হত্যা করা ছাড়া তাকে দমন করা যাবে না। নিরপরাধ মুসলিম লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? যদি অস্ত্র ব্যবহার বা হত্যা ছাড়া

সন্ত্রাসীটাকে দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত নিরপরাধ মুসলমান নিজে বা উপস্থিত লোকজন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে কি?

দ্বিতীয়ত: সন্ত্রাসী যদি নিরপরাধ লোকটাকে হত্যা করেই ফেলে, তাহলে শরীয়তের বিধান মতে একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার কারণে সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে হবে। একে কেসাস বলে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করতে পারবে?

দুই.

একটা লম্পট একজন নারীর সম্ভ্রবহানি করতে চাচ্ছে। সেখানে অনেকেই উপস্থিত। অবস্থা এমন যে, উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া কিংবা তাকে হত্যা করা ছাড়া নারীটির সম্ভ্রব

রক্ষা করা সম্ভব না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? উক্ত নারী কিংবা উপস্থিত লোকজন কি উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে?

দ্বিতীয়ত: লম্পট লোকটা যদি উক্ত নারীর সম্ভ্রবহানি করেই ফেলে, তাহলে তার উপর যিনার শাস্তি বর্তাবে। একে হদ বলে। লম্পটটা অবিবাহিত হলে তাকে একশ দোররা মারতে হবে আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি তার উপর যিনার হদ (বেত্রাঘাত বা প্রস্তারাঘাতে হত্যা) কায়েম করতে পারবে?

এ দু'টি উদাহরণে হত্যায় লিপ্ত সন্ত্রাসী এবং যিনায় লিপ্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ, কিংবা প্রয়োজনে হত্যা করে

নিরপরাধ মুসলমান ও উক্ত নারীকে রক্ষা করা হল- (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)। এটি ‘আমর বিল মা’রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের’ মধ্যে পড়ে। আর হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের নিয়মানুযায়ী হত্যাকারী বা যিনাকারকে হত্যা করা বা বেত্রাঘাত করা হল- (হদ ও কেসাস)।

এখন প্রশ্ন:

- সাধারণ জনগণ কি (আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার) এবং (হদ-কেসাস) উভয়টিই কায়েম করতে পারবে?
- না’কি কোনটাই পারবে না?
- না’কি একটা পারবে আরেকটা পারবে না?

উত্তর: একটা পারবে আরেকটা পারবে না। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হদ বা কেসাস কায়েম করতে পারবে না। হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তির

(যেমন- কাজি)। সাধারণ জনগণের তা কায়েম করার অধিকার নেই।

অতএব, উপরোক্ত উদাহরণ দু'টিতে নিরপরাধ মুসলমান এবং উক্ত নারীকে রক্ষার জন্য সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে। যদি হত্যা করা ব্যতীত উক্ত মহিলা বা মুসলমানকে রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাও করতে পারবে। এটি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার তাদের উপর হদ বা কেসাস কায়েম করতে পারবে না। তাই কেসাসস্বরূপ সন্ত্রাসীকে হত্যা বা হদরূপে যিনাকারকে হত্যা বা বেত্রাঘাত করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হল- একটা পারবে আরেকটা পারবে না কেন? আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে পারবে কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবে না কেন?

বিষয়টা একটু গোঁড়া থেকে বুঝতে চেষ্টা করি-

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদনের দায়িত্ব যেমন উম্মাহর, হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্বও উম্মাহর। কিন্তু আমর বিল মারূ’ফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন উম্মাহর পক্ষ থেকে উম্মাহর ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিগণ। সাধারণ জনগণ নিজেরা তা কায়েম করতে পারবে না। কারণ- আমর বিল মারূ’ফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং হুদুদ-কেসাসের মাঝে ব্যবধান আছে:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তার অনুমতি ব্যতীত কোন সাহাবী কোন হদ বা কেসাস কায়েম করেননি, কিন্তু আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই সম্পাদন করতেন।
- খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফতকালে হুদুদ-কেসাস খোলাফায়ে রাশেদিন নিজেরা বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিরা কায়েম করতেন। তাদের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ জনগণ তা কায়েম করতে পারতো না, কিন্তু আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই আঞ্জাম দিতেন।
- হুদুদ-কেসাস কায়েমের জন্য এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাকা

আবশ্যক যে, অবাধ্য অপরাধিদের পাকড়াও করে তাদের উপর হদ-কেসাস কায়েম করতে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়ারূপে যে ফিতনা-ফাসাদ সংঘটিত হওয়ার সম্ভবনা আছে তা প্রতিহত করতে পারে। আর স্পষ্ট যে, পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উদ্ভূত ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নেই, কিন্তু তা ইমাম বা সুলতানের আছে। সাধারণ জনগণ হদ বা কেসাস কায়েম করতে গেলে উল্টো আরো ফেতনা-ফাসাদ ছড়াবে। তাই তারা তা কায়েম করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। তারা তাদের শক্তিবলে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং উদ্ভূত সব ধরণের ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করতে পারবেন। তাই তারা হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন।

- সাধারণ জনগণের উপর আপত্তি আসতে পারে যে, তারা স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা অন্য কোন দুনিয়াবি স্বার্থে কাউকে শাস্তি দিচ্ছে বা হত্যা করছে। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের ক্ষেত্রে সাধারণত এ অভিযোগ আসবে না।

- চলমান উপস্থিত যুলুম ও অন্যায়ের অবস্থা এক রকম আর তা সম্পাদন শেষ হয়ে গেলে তার অবস্থা আরেক রকম। চলমান অবস্থায় অপরাধ দৃশ্যমান। চোখের সামনেই তা সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ শেষ হয়ে গেলে তখন এর

বিপরীতে হদ বা কেসাস কায়েমের জন্য শরীয়ত কয়েকটি জিনিস আবশ্যক করেছে। যেমন:

ক. যথোপোযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণসহ অপরাধ প্রমাণ করা।

খ. স্বাক্ষীদের অবস্থা যাচাই করা যে, তারা সত্যবাদি না মিথ্যাবাদি।

গ. হদ কায়েমের পর্যাপ্ত শর্তাবলী পাওয়া গিয়েছে কি'না- তা নিশ্চিত হওয়া।

ইত্যাদি আরোও বিভিন্ন বিষয়, যা হুদুদ-কেসাসে প্রয়োজন। কিন্তু অপরাধ যখন সংঘটিত হচ্ছে, একজন স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করছে, তখন এসব কিছুই দরকার নেই। তাই, জনসাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্ট কোন অন্যায় বা যুলুম সংঘটিত হলে তারা তৎক্ষণাৎ তা প্রতিহত করতে পারবে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করতে পারবে। কিন্তু হুদুদ-কেসাসের অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

বি.দ্র.-১

সাধারণ জনগণ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার কেবল ঐসব বিষয়েই করতে পারবে, যেগুলো শরীয়তে সুস্পষ্ট হারাম এবং সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। যেমন- যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় সুস্পষ্ট নয়, যেগুলো হারাম-হালাল উভয়টারই সম্ভবনা রাখে, সেসব বিষয়ে করতে পারবে না। উলামাগণ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে করতে পারবেন।

বি.দ্র.-২

কেউ যদি কাউকে যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদির মতো সুস্পষ্ট কোন অপরাধে লিপ্ত দেখে এবং তাকে হত্যা ব্যতীত উক্ত হারাম বা যুলুম থেকে বিরত রাখা সম্ভব না হয়, ফলে বাধ্য হয়ে তাকে হত্যা করে দেয়- তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে তার কোন জবাবদিহি করতে হবে না, বরং সওয়াবের অধিকারি হবে। কিন্তু কাজির দরবারে সে যদি উপযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে না পারে যে, উক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে, তাহলে কাজির দরবারে সে হত্যাকারী বলে বিবেচিত হবে। হত্যাকারি হিসেবেই দুনিয়াতে তার বিচার হবে। বিচারস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে হত্যার বদলে হত্যা করা হবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির

রক্তমূল্য (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে। আর যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে তাকে উপরোক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বাধ্য হয়ে হত্যা করেছে, তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে।

বি.দ্র.-৩

মুজাহিদগণ যে সব এলাকা দখল করেছেন, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন কি?

উত্তর: যেখানে মুজাহিদদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তারা ইসলামী ইমারা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে তো অবশ্যই কায়েম করবেন। আর যেসব এলাকায় তাদের একক আদিপত্য এখনোও কায়েম হয়নি, বরং হামলার মুখে যে কোন সময় ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন কি'না ভেবে দেখতে হবে। যদি সেখানে হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দ্বারা লোকজন বিগড়ে না যায়, জিহাদের কোন ক্ষতি না হয়, কাফেররা সুবিধা গ্রহণ না করার আশংকা না থাকে- তাহলে ইনশাআল্লাহ কায়েম করতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি লোকজন বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, জিহাদের ক্ষতির আশংকা থাকে, কাফেরদের সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে- তাহলে কায়েম করবেন না। হুদুদ-কেসাসের

পরিবর্তে মুনাসিব মতো অন্য কোন শরয়ী শাস্তি নির্ধারণ করে নেবেন। দাওয়াত, ইসলাহ ও সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। যতদিন আল্লাহ তাআলা পূর্ণ তামকীন না দেন, ততদিন জরুরত বশত এভাবে চলতে হবে। এটা আল্লাহর হুদুদ ও কেসাসের প্রতি উদাসীনতার কারণে নয়, জরুরতে কারণে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৬

বিশেষ আবেদন:

[ভাইদের প্রতি আবেদন- আমার এ বিষয়ের লেখাগুলো ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে না পড়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়, সেগুলো ভালভাবে খেয়াল করুন। বিষয়টা অনেক নাজুক। একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে মাসআলা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। হালাল হারাম হয়ে যাবে, হারাম হালাল হয়ে যাবে। তাই মনোযোগের সাথে বুঝে শুনে পড়ুন।

অধিকন্তু আমার উদ্দেশ্য- ভাইদের এখনই হামলায় নেমে

যাওয়া নয়। কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই যথাযথ মাসআলা বুঝে নিতে হবে এবং তা অফ লাইনে বুঝতে হবে। শুধু অন লাইনে পড়ে মাসআলা আগা-গোড়া সব বুঝে আসে না। তাই ভাইদের আমি নিষেধ করছি- আমার লেখার উপর ভিত্তি করে কারও উপর হামলা করবেন না। এর অনুমতি আমি দিই না। আমার উদ্দেশ্য- যাতে আমার লেখাটা পড়ে এ ব্যাপারে মৌলিক একটা ধারণা হাসিল হয়। বাকি বাস্তবে কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই, এবং অবশ্যই অফ লাইনে যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। তাই, ভাইয়েরা আমার! কেউ ভুল বুঝবেন না। তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। ওয়াসসালাম।]

পর্ব-৬

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া

উপরে আমরা আলোচনা করলাম, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার হিসেবে উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার অধিকার রাষ্ট্রের যেমন আছে, সাধারণ জনগণেরও আছে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করার অধিকার জনগণের আছে। শুধু যে, অধিকার আছে তাই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার ও হত্যা করা ফরয হয়ে পড়ে। এর ভিত্তি আরেকটা মাসআলার উপর। তা হল- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিধান কি? তা কি ফরয, না ফরয নয়? ফরয হলে কি ফরযে আইন, না ফরয়ে কেফায়া?

উত্তর: আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। তবে তা ফরযে কেফায়া। যেমন- জিহাদ ফরয তবে স্বাভাকি অবস্থায় তা ফরযে কেফায়া; এবং যেমন- কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও জানাযার নামায ফরয এবং তা ফরযে

কেফায়া। ফেরযে কেফায়ার অর্থ- উম্মাহর প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপরই তা ফরয, সরকারি-বেসরকারি সকলের উপরই তা ফরয, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা তা সম্পন্ন হয়ে গেলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যায়। আর কেউ-ই যদি আদায় না করে, তাহলে সামর্থ্যবান সকলেই গুনাগার হবে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার যেহেতু সকলের উপরই ফরয, তাই (সরকারি-বেসরকারি) যার সামনেই কোন সুস্পষ্ট অপরাধ সংঘটিত হবে, তারই দায়িত্ব তা প্রতিহত করা। প্রতিহত করতে গিয়ে যদি স্বাভাবিক হুমকি-ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহিন মারপিটের দ্বারা অপরাধী অপরাধ থেকে সরে পড়ে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা ছাড়া দমানো সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাই করতে হবে।

ফরযে কেফায়ার বিষয়টা পরিষ্কার করতে আগের উদাহরণে আবার ফিরে যাই। উক্ত উদাহরণে সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ

মুসলমান ব্যক্তিটির উপর চড়াও হয়েছিল। এখন তাকে প্রতিহত করার দরকার। উপস্থিত সকলের উপরই তা ফরয। তবে যদি উপস্থিত দুয়েক জন মিলে তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। কিন্তু কেউ-ই যদি প্রতিহত না করে, তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে। আর ফরয যেহেতু শুধু সরকারি লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকলের উপরই ফরয, তাই উপস্তিত লোকেরা নিজেরাই তা প্রতিহত করতে পারবে, রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে হবে না। বরং যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে গেলে আশঙ্খা হয়- সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ মুসলমান লোকটাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে উপস্থিত লোকদের জন্য জায়েয হবে না- নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থেকে তাকে হত্যা করতে দেয়া আর সরকারি বাহিনীর অপেক্ষা করা। বরং তাদের নিজেদেরকেই তখন এগিয়ে এসে তাকে প্রতিহত করতে হবে। তবে যদি কোনভাবে সন্ত্রাসী লোকটা মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে জনসাধারণের জন্য জায়েয হবে না, নিজেরাই কেসাসরূপে সন্ত্রাসীকে হত্যা করে ফেলা। বরং তারা তাকে পাকড়াও করে কাজির হাতে তুলে দেবে বিচারের জন্য। এরপর কাজি যখন তাদেরকে স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকবে, তখন তারা সত্য সত্য স্বাক্ষ্য দেবে।

এটাই তখন তাদের দায়িত্ব।

বি.দ্র-১

আলোচনা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার নিয়ে। কোন কুফরী রাষ্ট্র ও কাফের সরকার নিয়ে নয়।

বি.দ্র.-২

যদি কেউ আশংকা করে যে, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে গেলে তার জীবন চলে যেতে পারে বা তার কোন অঙ্গ নষ্ট হতে পারে, বা দীর্ঘ জেল-জরিমান হতে পারে: তাহলে তার জন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার থেকে বিরত থাকারও অবকাশ আছে। অবশ্য এ মূহুর্তেও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করাই উত্তম। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারা জন্য না করাটাও উত্তম হতে পারে।

বি.দ্র-৩

যারা কোন জিহাদি তানজীমের সাথে জড়িত, যাদের একজন ধরা পড়লে আরো অনেকেরই ধরা পড়ার এবং জান-মালের ক্ষতি বা বিনাশের আশংকা আছে- তাদের জন্য কোন আমর বিল মা'রূফ বা নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার আগে হিসাব করে দেখতে হবে, তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা লাভ কতটুকু হবে আর ক্ষতির আশংকা কতটুকু। বিশেষ করে বর্তমান এই দুর্বলতার যামানায় যেখানে মুজাহিদদের সংখ্যা অনেক স্বল্প, আবার তাগুত সরকার হন্যে হয়ে তাদের খুঁজছে- তাই এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নিতে অনেক হিসাব-নিকাশ করে নিতে হবে। কেননা, তার গ্রেফতারির দ্বারা যে শুধু তার নিজের জান, মাল, ও ইজ্জত-আব্রু হুমকির মুখে পড়বে তাই নয়, আরোও অনেককেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে পারে। তাই সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া চাই। এ ব্যাপারে তানজীমের কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে, যদি তা শরীয়তের সুস্পষ্ট পরিপন্থি না হয়, তাহলে তা মেনে চলা উচিৎ। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৭

দলীল-প্রমাণ

আমাদের মূল আলোচনা ছিল ‘কি কি কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে’- তা নিয়ে। বিষয়টি বুঝার জন্য প্রাসঙ্গিক আরও বিভিন্ন বিষয় এসে গেছে। এতক্ষণ যা আলোচনা হল তার সারকথা-

[আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা, হুদুদ-কেসাস কায়েম করা: সবগুলোই উম্মাহর দায়িত্ব। তবে বিশেষ মাসলাহাতের কারণে হুদুদ কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব খলিফা, সুলতান, উমারা, কাজি ও ক্ষমতাশীলদের উপর; আর আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা সকলেরই দায়িত্ব। প্রশাসন-সাধারণ জনগণ সকলেই তা

আঞ্জাম দিতে পারবে। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে যদি অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে প্রশাসনের ন্যায় সাধারণ জনগণও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হলে হত্যাও করতে পারবেন।]

আমাদের আলোচনা যেহেতু আমরা বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে, তাই আমরা হুদুদ-কেসাসের আলোচনায় যাবো না। আবার আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মধ্য থেকে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টিই যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়, তাই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়েও বিস্তারিত কোন আলোচনা এখানে করবো না। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফিক দেন তাহলে তা নিয়ে অন্য সময় স্বতন্ত্র রিসালায় আলোচনা করবো। এখানে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টির উপরই ক্ষান্ত করবো।

মুসলিম হত্যার বিষয়টি ঠিক ঠিক মতো বুঝার জন্য (সাধারণ

জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে কি'না?)- তা জানার দরকার ছিল। তাই এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল। এখানে তার কয়েকটি দলীল এবং আইম্মায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করবো। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

****

দলীল: সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।" (আলে

ইমরান: ১০৪)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়:

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয এবং তা ফরযে কেফায়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা উম্মাহর প্রত্যেকের উপর অত্যাবশ্যকরূপে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয করেননি, বরং তাদের মধ্য থেকে এ কাজের জন্য একটি দল থাকার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই উম্মাহর একটি অংশ এ কাজ করলেই বাকিদের উপর থেকে দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। আর কেউ-ই তা আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু মুসলিম প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা উম্মাহর সকলেরই তা তা দায়িত্ব। কারণ, আল্লাহ তাআলা গোটা উম্মাহকে সম্বোধন করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। একে শুধু শাসক শ্রেণীর সাথে খাছ করেননি।

- জনসাধারণও প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি

আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। কাজেই কোন অন্যায় দেখা গেলে তা প্রতিহত করতে হবে। যদি নরম গরম কথা, হুমকি ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহীন মারপিটে অন্যায় প্রতিহত হয়ে যায়, তাহলে তো ভালই; অন্যথায় অস্ত্র প্রয়োগে এমনকি হত্যা করে তা প্রতিহত করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কোন নির্দিষ্ট স্তরের বৈধতা দিয়ে অন্য স্তরকে হারাম করেননি, বরং নিঃশর্তভাবে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। এতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সকল স্তরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর তথা অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে আলোচনা এসেছে। আমি আরও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ...}

“তোমরাই (দুনিয়ায়) সর্বোত্তম জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের কাজ হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজে আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাঁধা দেবে।” (আলে ইমারান: ১১০)

এ আয়াত আগের আয়াতে অনুরূপ।

৩. আল্লাহ তাআলা লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ বিবৃত করেন-

{ يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

“ওহে আমার পুত্র! নামায কায়েম কর, লোকদের সৎকাজে আদেশ দাও ও মন্দ মন্দ কাজে বাঁধা দাও এবং (এ কারণে) তোমার যে কষ্ট দেখা দেয় তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা বড় হিম্মতের কাজ।” (লুকমান: ১৭)

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে লা’নত বর্ষিত হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো, তা থেকে একে অপরকে বারণ করতে না। তারা যা করতো, নিঃসন্দেহে তা ছিল নিকৃষ্ট।” (মায়েদা: ৭৮-৭৯)

নাহি আনিল মুনকারের মতো ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কারণে বনী ঈসরাঈলের উপর লা’নত বর্ষিত হয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}

“মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের

দিকে ফিরে আসে।” (হুজুরাত: ৯)

মুসলমানদের এক দল আরেক দলের সাথে দ্বন্দ্ব-মারামারিতে লিপ্ত হলে, তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। যদি তারা এর মাধ্যমে বারণ হয়ে যায় তো ভাল; অন্যথায় যে দল বাড়াবাড়ি করবে, মীমাংসায় রাজি না হবে- তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে, যুদ্ধ করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের বাড়বাড়ি ও সীমালঙ্গন ছাড়তে বাধ্য হয়। এখানে তাদেরকে যেহেতু অস্ত্র প্রয়োগ ও যুদ্ধ ব্যতীত বারণ রাখা সম্ভব না, তাই শরীয়ত অস্ত্র প্রয়োগ করার আদেশ দিয়েছে।

এ ছাড়াও আরোও অনেক আয়াতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আলোচনা এসেছে। এখানে এ কয়টা আয়াতই উল্লেখ করা হল।

সুন্নাহ্ থেকে দলীল

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

“তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।” (সহীহ মুসলিম: ১৮৬)

এ হাদিস প্রমাণ করে:

- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সামর্থ্যবান প্রতিটি সদস্যের উপর ফরয। কারণ, হাদিসে ব্যাপকভাবে সকলের প্রতিই আদেশ জারি করা হয়েছে। বিশেষ কোন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। তবে পূর্বে আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন একদল তা আদায় করে নিলে বাকিদের দায়িত্ব-ভার সরে যাবে।

- হাদিসে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করার আদেশ এসেছে। অতএব, যদি কথায় কাজ না হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, বরং নিঃশর্তভাবে শক্তি প্রয়োগের আদেশ এসেছে। অতএব, যদি অস্ত্রবিহীন মারপিটে কাজ না হয়, তাহলে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা করা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যা করে হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে।

এ ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি এখানে আরও কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি:

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))

“আমার পূর্বে যত উম্মতের কাছে যত নবী পাঠানো হয়েছে, তাদের সকলেরই নিজ উম্মতের মধ্য থেকে কতক হাওয়ারি ও সাহাবী ছিল, যারা তার সুন্নত আঁকড়ে ধরতো এবং তার আদেশের আনুগত্য করতো। তারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিকৃষ্ট উত্তরসূরিরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা এমনসব কথা বলবে, যা তারা করে না এবং এমন কর্ম করবে, যার আদেশ তাদের দেয়া হয়নি। যে স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে নিজ যবান দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। সে নিজ অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এ(অন্তর দিয়ে জিহাদ করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই।” (সহীহ মুসলিম: ১৮৮)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب))

“যখন লোকজন জালেমকে (জুলুম করতে) দেখেও তার হাত না আটকাবে, তখন অচিরেই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।” (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))

"যখন কোন সম্প্রদায়ে গুনাহের কাজ হয়, আর জাতির অন্য লোকসকল তা প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহত না করে, তখন অতিশীঘ্রই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর তার আযাব নাযিল করেন।" (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৫. ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال « فلا تعطه مالك ». قال أرأيت إن قاتلنى قال « قاتله ». قال أرأيت إن قتلنى قال « فأنت شهيد ». قال أرأيت إن قتلته قال « هو فى النار ».

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার মাল কেড়ে নিতে আসে? তিনি

জওয়াব দিলেন- তাকে তোমার মাল দেবে না। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমিও তার সাথে মারামারি কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।” (সহীহ মুসলিম: ৩৭৭)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)

“যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।” (আবু দাউদ: ৪৭৭২)

শেষোক্ত হাদিস দু’টিতে জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু, দ্বীন বা

পরিবার পরিজন রক্ষার্থে অস্ত্র প্রয়োগ এমনকি হত্যা পর্যন্ত করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এখানে এ ক'টিতেই ক্ষান্ত করা হল।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৮

সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য

১. ইবনে কাসীর রহ.

আল্লাহ তাআলার বাণী-

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।” (আলে ইমরান: ১০৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". اهـ

“এ আয়াতের উদ্দেশ্য- এ কাজে উম্মাহর একটি দল নিয়োজিত থাকতে হবে। অবশ্য তা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহর প্রত্যেকের উপরই ফরয। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

‘তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।’

অন্য বর্ণনায় আছে-

"وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

‘এ(অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই’।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৯১)

ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল- আমরা বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের উপরই ফরয। প্রত্যেকের উপর তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

২. ইমাম নববী রহ.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأَحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، اهـ. والله أعلم

"উলামায়ে কেরাম বলেন, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ। ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন, 'এর দলীল: মুসলিম উম্মাহর ইজমা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী যামানায় শাসকবর্গ ছাড়া সাধারণ জনগণও আমরা বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন। মুসলিম উম্মাহ তাদের সমর্থন করেছেন। শাসন-কর্তৃত্ব ছাড়াই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা তাদের কোন তিরস্কার করেননি।' ওয়াল্লাহু আ'লাম।" (শরহে মুসলিম লিন-নববী: ২/২৩)

লক্ষ্য করুন- **(আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম**

জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ।)

৩. ইমাম জাসসাস রহ.

বক্তব্য-১:

باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مطلب: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية

قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ... قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض, فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. اهـ

"বাব: আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

মতলব: আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।'

এ আয়াত দু'টি বিষয় বুঝাচ্ছে:

এক. আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

দুই. তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে, বাকিদের উপর ফরয থাকবে না।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলছেন- {وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ} '(এ কাজের জন্য) তোমাদের মাঝে একটি দল থাকা চাই।' যার দাবি- উম্মাহর একটি অংশ, (সকলে নয়)। বুঝা গেল, তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে বাকিদের থেকে তার দায়িত্ব-ভার সরে যাবে।" (আহকামুল কুরআন: ২/৩৭)

বক্তব্য-২:

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করার পর বলেন,

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي على منازل: أولها تغييره باليد إذا أمكن, فإن لم يمكن وكان في نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه, فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه. اهـ

“এ সকল আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতের দাবি- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। এর বিভিন্ন দরজা রয়েছে। সর্বোচ্চ দরজা হল, সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয় এবং শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করতে গেলে জীবনের আশংকা হয়, তাহলে যবান দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি পূর্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ জীবনের আশংকায়) তাও অসম্ভব হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে।” (আহকামুল কুরআন: ২/৩৮)

বক্তব্য-৩:

এরপর তিনি এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন,

وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته, ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله; وإزالته باليد تكون على وجوه: منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف, وأن يأتي على نفس

فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك. كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ مال أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك, وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله; لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره بيده" , فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه. وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله, وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه, ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه, ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله. اهـ

“এসব হাদিস প্রমাণ, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দুটি হালত রয়েছে-

যখন অন্যায় প্রতিহত ও দূরীকরণ সম্ভব। এমতাবস্থায় শক্তিবলে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য যার আছে, তার উপর ফরয- তা প্রতিহত করা।

শক্তিবলে প্রতিহত করার বিভিন্ন সূরত হতে পারে:-

হয়তো তরবারি ব্যবহার করা এবং অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় এমনটা করাই (অর্থাৎ তরবারি প্রয়োগে করে হত্যা করে দেয়াই) তার কর্তব্য।

যেমন- কেউ দেখলো, এক ব্যক্তি তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা তার মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, কিংবা কোন মহিলার সাথে যিনা করতে চাচ্ছে, কিংবা এ রকম অন্য কোন অন্যায় করতে চাচ্ছে। আর সে জানে, কথা বা অস্ত্রবিহীন বাধার দ্বারা সে বিরত হবে না। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য- তাকে হত্যা করে দেয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"من رأى منكرا فليغيره بيده"

‘তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে।’

যখন উক্ত অন্যায়ে অটল ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব না, তখন তার উপর ফরয- তাকে হত্যা করে দেয়া।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, অস্ত্র ছাড়া (খালি) হাতে বাধা দেয়ার দ্বারাই সে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে হত্যা করতে যাওয়া জায়েয হবে না।

আর যদি প্রবল ধারণা হয়, মুখে বা বা (খালি) হাতে বাধা দিতে গেলে সে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং এরপর তার পক্ষ থেকে কোন ধরণের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতীতই তাকে হত্যা করে দেয়া ছাড়া তাকে তা থেকে বিরত রাখা এবং

অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভব হবে না- তাহলে তার জন্য আবশ্যক: তাকে হত্যা করে দেয়া।” (আহকামুল কুরআন: ২/৪০)

অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার ব্যাপারে জাসসাস রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

৪. ইমাম কুরতুবী রহ.

فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل، وهذا تلقي من قول الله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شي عليه. ولو رأى زيد عمراو قد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به. اهـ

“যদি যবান দ্বারা অন্যায় প্রতিহত করতে পারে, তাহলে তাই করবে। আর যদি শাস্তি বা হত্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাই করবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত হয়ে গেলে হত্যা জায়েয হবে

না। এই মাসআলা গৃহীত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে-

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "

‘(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।’

এর ভিত্তিতেই উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন ব্যক্তির নিজের জান-মালের উপর বা অন্য কারো জান-মালের উপর কেউ আক্রমণ করলে, সে উক্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে পারবে এবং এর বিপরীতে তার উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না। যায়েদ যদি আমরকে দেখে যে, সে বকরের মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, তাহলে দেখতে হবে- মালের মালিক যদি আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় এবং সে মাল প্রদানে সম্মতও নয়, তাহলে যায়েদের উপর ফরয বকরকে রক্ষা করা এবং আমরকে প্রতিহত করা।” (তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪৯)

আশাকরি এ বক্তব্যগুলো থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করে অন্যায় প্রতিহত করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে-৯

((অনেক দিন হল লেখাটা শুরু করেছিলাম। সময়-সুযোগের অভাবে শেষ করা গেল না। এখন আলহামদু লিল্লাহ কিছুটা সুযোগ হয়েছে। তাই আবার লিখতে শুরু করলাম।))

হত্যার শ্রেণীবিভাগ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি যে, কি কি কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা যায়। এখানে বিষয়টাকে আরেকটু পরিষ্কার করে তোলার চেষ্টা করব।

যেসব কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা যায়, তার সবগুলো একই শ্রেণীভুক্ত নয়। একেক জনের হত্যা একেক শ্রেণীভুক্ত। মৌলিকভাবে আমরা মুসলিম হত্যাকে নিম্নোক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি:

১. হদরূপে হত্যা।

২. কেসাসরূপে হত্যা।

৩. دفع الصائلতথা জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে হত্যা।

৪. সিয়াসত ও তা'যিররূপে হত্যা।

এক. হদ

হদ বলা হয় শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত শাস্তি, যাতে কোন ধরণের কম-বেশ বা পরিবর্তনের সুযোগ নেই এবং যা প্রমাণিত হওয়ার পর মাফ করার কোন সুযোগ নেই। যেমন- চোরের হাত কাটা। এটা হদ। এতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। হাত কাটার বদলে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা যাবে না। তদ্রূপ কাযির দরবারে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে চুরি প্রমাণিত হওয়ার পর চোরকে মাফ করে দেয়া এবং হাত না কেটে ছেড়ে দেয়ারও কোন সুযোগ নেই।

হানাফি মাযহাব মতে ছয়টি অপরাধের শাস্তি হদ বলে গণ্য:

১. যিনা।

২. মদপান।

৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন নেশাজাত দ্রব্য সেবনে মাতাল হয়ে পড়লে। অবশ্য এর শাস্তি মদপানের শাস্তির সমান তথা আশি দোররা।

৪. কজফ তথা পূত-পবিত্র কোন স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া ।

৫. চুরি।

৬. রাহাজানি।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০হি.) থেকে বর্ণনা করেন,

وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق. اهـ

“হদ ছয় প্রকার: ১. যিনার হদ। ২. মদপানের হদ। ৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন মাদক সেবনে মাতাল হওয়ার হদ। তবে শাস্তির পরিমাণ উভয়টাতে একই। ৪. কজফ তথা যিনার অপবাদ লাগানোর হদ। ৫. চুরির হদ। ৬. রাহাজানির হদ।” (রদ্দুল মুহতার: ৪/৩)

হদরূপে যাদের হত্যা করা হবে

১. বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা

এদেরকে রজম করে তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। আর অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত লাগানো হবে। বেত্রাঘাত কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা, আর রজম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

"যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারী নারী: প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখ, তাহলে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মু'মিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (নূর: ২)

হাদিসে এসেছে,

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين

التارك للجماعة.

“যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।” (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

ইসলামে রজমের বিধান শুরু হয় ইয়াহুদিদের দিয়ে। দুই ইয়াহুদি নারী-পুরুষ যিনা করে। ইয়াহুদিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে আসে। তিনি তাদের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করেন এবং বলেন,

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه

“হে আল্লাহ! তারা যখন তোমাদের আদেশ মিটিয়ে দিয়েছে, তখন সর্ব প্রথম আমি তা যিন্দা করলাম।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাবু রজমিল ইয়াহুদ; সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাবুররজমি ফিল বালাত্ব।)

মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে লজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে নিজ অপরাধ স্বীকার করে হদ কায়েম করতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি বার বার হদ কায়েমের জন্য আবেদন করতে থাকেন। এভাবে চার বার করার পর তিনি রজমের আদেশ দেন। ফলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: আর-রজমু বিল মুসাল্লা; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হদ কায়েমের আবেদন জানান। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তাকেও রজম করে হত্যা করেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো

বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

উল্লেখ্য যে, হানাফি মাযহাব মতে উক্ত নির্বাসন হদ হিসেবে নয়, সিয়াসত হিসেবে। ইমামুল মুসলিমিন যদি কাউকে নির্বাসন দেয়া উচিৎ মনে করেন তাহলে দিতে পারেন। অন্যথায় নির্বাসন দেয়া জরুরী নয়। আর যদি নির্বাসন দিতে গেলে উক্ত লোক মুরতাদ হয়ে যাওয়ার বা গোমরাহ হয়ে যাওয়ার বা অন্যদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে কিংবা অন্য কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নির্বাসন দেয়া উচিৎ হবে না। (দেখুন : শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবি, ৬/১৬২-১৬৩; বাদায়িউস সানায়ি': ৫/৪৯৬)

২. ডাকাত ও রাহজান

প্রধানত ডাকাত ও রাহজান বলতে সেসব লোককে বুঝায়, যারা চলন্ত রাস্তার আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে

চলাচলরত পথিকদের উপর হামলা করে তাদের মাল লুণ্টন করে। মালের স্বার্থে প্রয়োজনে তাদের জখম বা হত্যা করে। ফিকহের পরিভাষায় ডাকাত বলতে সাধরণ এদেরকেই বুঝানো হয়। তবে আইম্মায়ে কেরাম ঐসব লোককেও ডাকাত ও রাহজানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা কোন প্রকার তাবীল ব্যতীত শুধুই অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে ইমামুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফাসেক, জালেম বা মুরতাদ শাসক অপসারণ করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়, অর্থ-সম্পদ আর নেতৃত্ব-ক্ষমতাই তাদের উদ্দেশ্য।

তবে সব ধরণের ডাকাতকে হত্যা করা হবে না। ডাকাতি ও রাহজানির শাস্তি অপরাধের মাত্রা হিসেবে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

- যদি রাহাজানি করতে গিয়ে কাউকে হত্যা করে, তাহলে হদস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে।

- যদি হত্যার পাশাপাশি মালও লুণ্টন করে, তাহলে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে কিংবা হত্যা করে তিন দিন পর্যন্ত শূলে লটকিয়ে রাখা হবে।

- যদি হত্যা না করে, শুধু মাল লুণ্টন করে: তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া হবে (অর্থাৎ ডান হাত ও বাম

পা)।

- আর যদি হত্যাও না করে, মালও লুণ্টন না করে বরং এর আগেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে পাকড়াও করে প্রথমত প্রহার করা হবে অতঃপর জেলে বন্দী করে রাখা হবে। যখন তাওবা করে ভাল হয়ে যাবে এবং চেহারা ও চাল-চলনে তাওবার সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ পাবে, তখন ছাড়া হবে। অন্যথায় মৃত্যু পর্যন্তই জেলে বন্দী করে রাখা হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” (মায়েদা: ৩৩)

বি.দ্র.

একাধিক ব্যক্তি বা এক দল মিলে রাহাজানি করলে সবার উপরই সমান শাস্তি বর্তাবে। যেমন, কেউ লুণ্টন ও হত্যা করেছে আর কেউ পাহারা দিয়েছে- তাহলে হদরূপে সকলকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারীদেরকেও হত্যা করা হবে, পাহারাদারদেরকেও হত্যা করেছে। কারণ, হত্যাকারীরা মূলত পাহারাদারদের পাহারার কারণেই হত্যা করতে সমর্থ্য হয়েছে। কাজেই, হত্যায় সকলেই অংশীদার। সকলের উপরই হত্যার বিধান আরোপ হবে।

ডাকাত ও রাহজানদের এ শাস্তিগুলো হদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ তা মাফ করতে পারবে না। কেননা, হদ আল্লাহর হক। কেউ তা মাফ করার অধিকার রাখে না। তবে এরা যদি পাকড়াও হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নেয় এবং স্বেচ্ছায় ইমামুল মুসলিমীনের কাছে এসে ধরা দেয়, তাহলে আল্লাহর হক তথা হদ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“তবে তোমরা তাদের পাকড়াও করার পূর্বেই যারা তাওবা করে নেবে, তাদের বিষয়টা ব্যতিক্রম। এরূপ ক্ষেত্রে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (মায়েদা: ৩৪)

আল্লাহর হক মাফ হয়ে গেলেও বান্দার হক তাদের উপর বর্তাবে। তখন বান্দার হক হিসেবে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিতে হবে। কাউকে জখম বা কোন অঙ্গ নষ্ট করে থাকলে তার বদলা নেয়া হবে। কাউকে হত্যা করে থাকলে কেসাস নেয়া হবে।

এ দু’টি অপরাধ হদ হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের দ্বিমত নেই। আরোও কয়েকটি অপরাধ রয়েছে, যেগুলো হদ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে:

৩. সমকামীতা।

৪. নামায তরক করা।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে- ১০

তিন. সমকামিতা

মানব ইতিহাসে এটি অতীব জঘন্য অপরাধ। সর্বপ্রথম লূত আলাইহিস সালামের কওম এই জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়। এদের পূর্বে এই কর্মের চিন্তা কারো মাথায় আসেনি। আল্লাহ তাআলা এদেরকে এমন ভয়াবহভাবে ধ্বংস করেছেন, যা অন্য কোন কওমকে করেননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)

“আমি লূতকেও পাঠালাম। যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যাও! (আর এটা তো কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং তোমরা এমন লোক যে,

(সভ্যতার) সীমা চরমভাবে লংঘন করেছো। তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, ‘এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।’ অতঃপর (যখন আমার আযাব এলো,) তখন আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম। তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকলো (যাদের উপর আযাব আপতিত হল)। আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং চেয়ে দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কেমন ভয়াবহ হয়েছিল!” (আ’রাফ: ৮০-৮৪)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)

“আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক (পাথর) বৃষ্টি। আগে থেকেই যেসব লোককে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের উপর বর্ষিত সে বৃষ্টি কতই না মন্দ ছিল!” (নামল: ৫৮)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)

“অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর থাকে থাকে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল। সে জনপদ এই জালিমদের থেকে দূরে নয়।” (হুদ: ৮২-৮৩)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)

“সুতরাং সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই মহানাদ তাদের আঘাত করল। অনন্তর আমি সে ভূখণ্ডকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর-ধারা বর্ষণ করলাম। নিশ্চয়ই অনুসন্ধানীদের জন্য এসব ঘটনার মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে।” (হিজর: ৭৩-৭৫)

হাদিস শরীফে সমকামিদের হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)

“কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ

(অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে যে করেছে এবং যার সাথে করেছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দাও।” (আবু দাউদ: ৪৪৬৪ , তিরিমিযি: ১৪৫৬)

তবে সমকামিদের শাস্তির ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের দ্বিমত আছে:

কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করে দিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, তাদের শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ। অর্থাৎ অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তাদের মতে সমকামিতা যিনার মতোই হদের অন্তর্ভুক্ত।

আবার কারো কারো মতে তাদের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ নয়। আবার সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করাও আবশ্যক নয়। বরং তাদের শাস্তি তা’যিররূপে গণ্য। তা’যির বলা হয় অনির্ধারিত শাস্তিকে। অর্থাৎ

ইমামুল মুসলিমীন যে ধরণের শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন দিতে পারবেন। যদি প্রহার ও বন্দীর দ্বারাই তারা বিরত হবে মনে হয়, তাহলে এতেই ক্ষান্ত রাখবেন। কিন্তু যারা এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তাদেরকে হত্যা করে দেবেন। বিবাহিত হলেও, অবিবাহিত হলেও।

ইমামুল মুসলিমীন এদেরকে অত্যন্ত ভয়াবহ পন্থায় হত্যা করবেন। যেমন:

১. আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন।
২. কিংবা দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে চাপা দিয়ে হত্যা করবেন।
৩. কিংবা উঁচু পাহাড় বা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করবেন। পড়ন্ত অবস্থায় উপর থেকে পাথর বর্ষণ করবেন, যেমনটা লূত আলাইহিস সালামের কওমের সাথে করা হয়েছে।
৪. কিংবা অতীব দূর্গন্ধময় স্থানে আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না দূর্গন্ধের প্রকটতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
(দেখুন: হেদায়া: ২/৫১৬, ফাতহুল কাদির: ৫/২৪৯-২৫২, রদ্দুল মুহতার: ৪/২৭)

বি.দ্র.

*জুলহাজ মান্নান ও তার সমকামি বন্ধু সামির মাহবুব তনয় যদি মুরতাদ নাও হয়ে থাকতো, তাহলেও শুধু এ সমকামিতার অপরাধে এবং তার প্রচার-প্রসারের অপরাধেই তাদের হত্যা করে দেয়া আবশ্যক হতো। *এমন নাপাক কীটদের যমিনে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।*

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে- ১১

চার. নামায তরককারী

নামায তরককারীর ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

হানাফি মাযহাব মতে নামায তরককারীকে বন্দী করে শাস্তি দিতে থাকা হবে। যতদিন নামায পড়তে শুরু না করবে, ততদিন জেলে আটকে রেখে শাস্তি দিতেই থাকা হবে। হয়তো নামায পড়তে সম্মত হবে, নয়তো এভাবে বন্দী অবস্থায়ই মারা যাবে।

আর আইম্মায়ে সালাসা (মালেক, শাফিয়ি ও আহমাদ) রাহিমাহুমুল্লাহর অভিমত অনুযায়ী- বন্দী করার পর যদি নামায পড়তে সম্মত না হয়, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে।

তবে কি হিসাবে হত্যা করা হবে সেটাতে মতভেদ আছে। আহমদ রহ. এর মতে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর মালেক রহ. ও শাফিয়ি রহ. এর মতে হদরূপে হত্যা করা হবে, যেমন বিবাহিত যিনাকারকে হদরূপে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ তাদের মতে সে মুরতাদ হয়নি, তবে যিনার শাস্তির মতো নামায তরকের শাস্তি হল- হত্যা।

অর্থাৎ আহমাদ রহ. এর মতে নামায তরককারী মুরতাদ। মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। আর বাকি তিন ইমামের মতে মুরতাদ নয়। তবে মালেক রহ. ও শাফিয়ি রহ. এর মতে হদরূপে হত্যা করা হবে। আর আবু হানিফা রহ. এর মতে জেলে বন্দী রেখে শাস্তি দেয়া হবে।
[দেখুন: কিতাবুস সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা- ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.); পৃষ্ঠা: ১২-১৩]

পাঁচ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী

আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত যে, সাধারণ মুরতাদের শাস্তি হল- হত্যা করে দেয়া। তবে যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। তখন আর হত্যা করা হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে কটুক্তি করবে, সে সর্বসম্মতিতে মুরতাদ। তবে সাধারণ মুরতাদ যেমন তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তার তাওবা কবুল করে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়া হয়, এর ব্যাপারেও এমনটি করা হবে কি'না সেটা মতভেদপূর্ণ।

মালেকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে দুনিয়াতে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে। কেননা, তাদের মতে কটুক্তিকারী মুরতাদের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত। আর হদ তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না। যেমন- কারো

ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে যিনা প্রমাণিত হওয়ার পর যদি সে তাওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আখেরাতে মাফ করবেন ঠিকই, কিন্তু দুনিয়াতে অবশ্যই তার উপর যিনার শাস্তি কায়েম করতে হবে। তদ্রূপ কটুক্তিকারী (মুসলিম হোক অমুসলিম হোক) তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়াতে অবশ্যই তাকে হদরূপে হত্যা করে দিতে হবে।

শাফিয়ি মাযহাব মতে কটুক্তিকারীর শাস্তি কোন কোন সূরতে হদের অন্তর্ভুক্ত (তখন তাকে মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করে দিতে হবে) আর কোন কোন সূরতে হদের অন্তর্ভুক্ত নয় (তখন তাওবা করে মুসলমান হলে মাফ করে দেয়া হবে)।

হানাফি মাযহাব মতে কটুক্তিকারী মুরতাদের শাস্তি অন্যান্য মুরতাদদের মতোই। হদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে হত্যা করা হবে না। তবে কোন যিম্মি যদি কটুক্তির পর তাওবা করে মুসলামন হয়, তাহলে তার ব্যাপারে একটু ভিন্নতা আছে। তাহলো- যদি পাকড়াও করার আগেই মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। আর পাকড়াও করার পর মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করে দিতে

হবে।

[দেখুন: ফাতাওয়া শামী, ৪/২৩৩, বাবুল মুরতাদ; ৪/২১৫, বাবুল উশরি ওয়াল খারাজি ওয়াল জিযইয়া]

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১২

দুই. কেসাস (القصاص)

কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলায় তাকেও হত্যা করা, কিংবা কেউ কারো কোন অঙ্গ নষ্ট করলে অঙ্গের বদলায় তারও উক্ত অঙ্গ নষ্ট করাকে কেসাস বলে। তবে আমাদের এ আলোচনায় কেসাস দ্বারা হত্যার বদলে হত্যা উদ্দেশ্য।

কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে কেসাসের বিধান রয়েছে। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যে কাউকে হত্যা করলেই তার বিপরীতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে- এমনটা নয়।

কেসাসের বিধান আরোপ হওয়ার জন্য মৌলিকভাবে দু'টি শর্ত বলা যায়-

প্রথম শর্ত

যাকে হত্যা করা হয়েছে সে ব্যক্তি محقون الدم على التابيد হতে হবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি হতে হবে, শরীয়ত যার জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে এবং শরীয়ত সম্মত কোন কারণ না পাওয়া গেলে চিরদিনের জন্য তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

উপরোক্ত মূলনীতির নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না-

১. হরবি তথা এমন কাফের যাদের সাথে মুসলমানদের কোন চুক্তি নেই।

২. মুআহাদ তথা এমন কাফের যাদের সাথে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছে।

৩. মুসতা'মিন তথা এমন কাফের যে মুসলমানদের অনুমোদন

নিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য দারুল ইসলামে এসেছে। এদের কাউকে হত্যার দ্বারা কেসাসের বিধান আসবে না। অর্থাৎ কোন মুসলমান এ তিন শ্রেণীর কোন কাফেরকে হত্যা করলে তার বিপরীতে উক্ত মুসলামনকে হত্যা করা হবে না। কারণ, এসব কাফেরের জান-মাল মূলত মুসলমানদের জন্য হালাল। মূলত এদেরকে হত্যা করাও বৈধ, তাদের মাল-সম্পদ লুট করাও বৈধ।

সরাসরি হরবি তথা যেসব কাফেরের সাথে কোন চুক্তি নেই- তাদের বিষয়টা তো স্পষ্টই। আর বাকি দুই প্রকার কাফের তথা মুআহাদ ও মুসতা'মিনকে যদিও চুক্তি ও নিরাপত্তা দানের কারণে আপাতত হত্যা করা বৈধ নয়, কিন্তু মূলত তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। চুক্তি বা নিরাপত্তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেই অন্যান্য হরবি কাফেরের মতো তাদের হত্যা করা ও মাল লুণ্টন করা হালাল হয়ে যাবে। অতএব, তাদের জান-মাল চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত নয়। তাই তাদের হত্যা দ্বারা কোন মুসলমানের উপর কেসাসের বিধান আরোপিত হবে না। অবশ্য চুক্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকাবস্থায় হত্যা করার কারণে মুসলমান গুনাহগার হবে।

কাফেরের চতুর্থ প্রকার- যিম্মি। তথা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান করত দারুল ইসলামের বসবাসকারী কাফের। এদের হত্যার দ্বারা মুসলমান থেকে কেসাস নেয়া হবে কি'না সেটা আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মত বিরোধপূর্ণ।

৪. মুরতাদ। কেননা, তার জীবনের নিরাপত্তা শেষ। তাকে হত্যা করা ফরয।

• এমনসব মুসলমানকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না, যারা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি কিংবা শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে উপরোক্ত অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এবং দারুল ইসলামের শরয়ী কাযি তাদের হত্যার ফায়সালা দিয়েছেন। যেমন-

৫. বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা।

৬. ডাকাত ও রাহজান (পুরুষ হোক বা মহিলা)।

অতএব, যদি কাযি সাহেব কোন মুসলমানকে যিনা বা রাহজানির কারণে হত্যার ফায়সালা দেন, অতঃপর সরকারী জল্লাদ বা হত্যায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে- তাহলে উক্ত মুসলমানের উপর কেসাস আসবে না। অর্থাৎ হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, মুসলমানের জান-মাল সুরক্ষিত হলেও সে যে মুসলামনকে হত্যা করেছে, সে মুসলমান সুরক্ষিত নয়। বরং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সে হত্যাযোগ্য। তাই তাকে হত্যার কারণে কেসাস আসবে না। অবশ্য কাযি সাহেবের আদেশ ছাড়াই নিজে নিজে হত্যা করার কারণে তাকে তা'যির করা হবে। কিন্তু কাযি সাহেবের ফায়সালা দেয়ার আগেই যদি হত্যা করে দেয়, তাহলে মাসআলা ভিন্ন।

দ্বিতীয় শর্ত

القتل العمد হতে হবে। তথা জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত হত্যা করতে হবে। অতএব, কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে অজান্তে বা ভুলবশত হত্যা করে ফেলে তাহলে এ হত্যার

বিপরীতে কেসাস আসবে না। অবশ্য রক্তমূল তথা দিয়াত দিতে হবে এবং ইস্তিগফার করতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহ মাফ চাইতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে, তার অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যাও করতে পারে, ইচ্ছে করলে মাফও করে দিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে হত্যার বদলে দিয়াতও আদায় করতে পারে। অবশ্য দিয়াত আদায় করতে হলে হত্যাকারী তাতে সম্মত হতে হবে কি'না সেটা আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ।

সারকথা এই দাঁড়াল-

মুরতাদকে কিংবা যিম্মি ছাড়া অন্য কোন কাফেরকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না। যিম্মিকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে কি'না সেটা মতবিরোধপূর্ণ। আর যেসব মুসলমানের ব্যাপারে যিনা বা রাহজানিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে শরয়ী কাযি কতৃক হত্যার ফায়সালা এসেছে, তাদের হত্যার দ্বারাও কেসাস আসবে না। যাদের হত্যার দ্বারা কেসাসের বিধান আরোপিত

হয়, নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছে করলে সেখানেও কেসাস না নিয়ে মাফ করে দেয়ার কিংবা দিয়াত আদায় করার সুযোগ রয়েছে।

তবে হদ এর ব্যতিক্রম। হদ মাফ করার কিংবা তার বদলে দিয়াত বা কোন অর্থ আদায় করার অবকাশ নেই।

[দেখুন: ফাতাওয়া শামী: ৬/৫৩২-৫৩৪, ফি মা ইউজিবুল ক্বাওয়াদ ওয়া মা লা ইউজিবুহ্; হেদায়া: ২/২০২, বাবুশ শাহাদাতি আলায যিনা ওয়ার রুজুয়ি আনহা; ফাতহুল ক্বাদির: ৫/৪১৬, বাবু কতয়িত তরীক; আহকামুল কুরআন- জাসসাস: ১/১৭৪, সূরা বাক্বারা, আয়াতুল কেসাস।]

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৪

চার. সিয়াসত (السياسة) ও তা'যির (التعزير) হিসেবে হত্যা

সিয়াসত ও তা'যির সমার্থক। শরীয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত নয় যেসব অপরাধের শাস্তি ইমামুল মুসলিমিন, সুলতান ও কাযির বিবেচনার উপর ন্যস্ত। যেখানে যে পরিমাণ

শাস্তি দেয়া মুনাসিব মনে হয় সে পরিমাণ দেবেন। যে পরিমাণের দ্বারা অপরাধীকে বিরত রাখা ও সমাজ থেকে সব ধরণের অন্যায়-অনাচার ও বিশৃংখলা দূর করে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ দ্বীনি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা যায়, সে পরিমাণ শাস্তিই দেবেন। তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয নয়। এ শাস্তির নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা আছে। আল্লাহ চাহেন তো হদ-তা'যির নিয়ে আলাদাভাবে লিখার ইচ্ছা আছে। সেখানে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হত্যার মাধ্যমেও তা'যির হতে পারে। সাধারণত একে القتل سياسةً তথা সিয়াসতরূপে হত্যা বলা হয়। যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত নয়, কিন্তু অপরাধগুলো এমন যে, সেগুলোর প্রভাব অন্যের উপর পড়ে, জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়- সেগুলোতে হত্যার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধ যখন কোন ব্যক্তি বার বার করতে থাকে, তখন তাকে হত্যা করে দিতে হয়। তদ্রূপ, যেসকল ব্যক্তি দ্বীনি পরিবেশ নষ্ট করে, যাদের দ্বারা দ্বীন বিকৃতির আশঙ্কা হয়- তাদেরকেও হত্যার বিধান রয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে- যারা সমাজে দ্বীনি বা দুনিয়াবি ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটায়, তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে- যদিও তারা মুসলমান হয়, নামায-রোযাসহ অন্য সকল যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর পাবন্দ হয়।

কুরআন সুন্নাহয় ফাসাদকারীদেরকে হত্যার নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}

"কাউকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।" (মায়েদা: ৩২)

এ আয়ত থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ কেউ পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা করে বেড়ালে তাকেও হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

فكان في مضمون الآية إباحة قتل المفسد في الأرض. اهـ

"আয়াত বুঝাচ্ছে- যমিনে বিশৃংখলাকারীকে হত্যা করা বৈধ।"

(আহকামুল কুরআন: ২/৫০৫)

দ্বীনি-দুনিয়াবি উভয় ধরণের ফাসাদ এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়াবি ফাসাদ, যেমন: চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, সন্ত্রাসী, খুন, ধর্ষণ, যাদু-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা, জনজীবন অতিষ্ট করে তোলা।

দ্বীনি ফাসাদ, যেমন: ইলহাদ, যান্দাকাহ্, নাস্তিকতা, বিদআত ইত্যাদি ছড়ানো।

এ উভয় ধরণের ফাসাদকারীকেই হত্যা করা যাবে- যদি হত্যা ব্যতীত তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হয়। এ ধরণের হত্যাকে সিয়াসত বলে।

সিয়াসত কাকে বলে?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিয়াসত সম্পর্কে আশাকরি কিঞ্চিত ধারণা হয়েছে। তবে সিয়াসতের পরিধি অনেক ব্যাপক। শুধু হত্যার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। তদ্রূপ কোন এক প্রকার অপরাধের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। সিয়াসত সকল বিষয়ের সাথেই জড়িত। সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করা দরকার তার সবগুলোকেই সিয়াসত বলে। তবে তা শরীয়ত বহির্ভূত না হতে হবে। শরীয়ত বহির্ভূত হলে তা আর ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জুলুমে পরিণত হবে, যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) ইবনে আকীল রহ. (৫১৩হি.) থেকে সিয়াসতের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন,

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولا نزل به وحي. اهـ

“সিয়াসত হচ্ছে এমন কর্মপন্থা, যারা মাধ্যমে লোকজন কল্যাণ ও শৃংখলার অধিকতার নিকটবর্তী হবে এবং ফাসাদ ও বিপর্যয় থেকে অধিকতর দূরে থাকবে; যদিও তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রণয়ন করেননি এবং সে ব্যাপারে কোন ওহীও নাযিল হয়নি।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১৭)

উদ্দেশ্য- যদিও সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই এবং সুস্পষ্ট কোন ওহীও সে ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি; কিন্তু শরীয়তের মূলনীতির দাবি এমনই। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই, সেগুলোতে শরীয়তের সার্বিক মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল সিয়াসত। পক্ষান্তরে যদি তা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত হয় কিংবা শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী হয়, তাহলে তা ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জালেম সিয়াসতে পরিণত হবে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة. اهـ

“সিয়াসত দুই প্রকার: ১. জালেম সিয়াসত; শরীয়ত একে হারাম ঘোষণা করে। ২. আদেল তথা ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত, যা জালেম ও পাপিষ্ঠের নিকট থেকে প্রাপ্য উদ্ধার করে। এটি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১০)

তিনি আরোও বলেন,

فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم وإنما هي عدل الله ورسوله. اهـ

“কাজেই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত শরীয়তের ভাষ্যের পরিপন্থি। বরং তা শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং তা শরীয়তেরই একটি অংশ, যদিও তোমাদের পরিভাষার অনুকরণে আমরা তাকে সিয়াসত নাম দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ ও তার রাসূল প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ বিধান।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১৮)

অতএব, নিজের মনগড়া বিধান ও ফায়সালা দিয়ে দেয়ার নাম ইসলামী সিয়াসত নয়, বরং শরয়ী উসূল ও মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো ইসলামী সিয়াসত। শরয়ী

উসূলের পরিপন্থি হলে তা আর ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জুলুম ও হারামে পরিণত হবে।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر. وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية، والرأي فيها إلى الإمام على ما في الكافي ... فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. اهـ

"ফাতহুল কাদিরের বক্তব্য এদিকে ঈঙ্গিত করে যে, সিয়াসত শুধু যিনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ... কুহুসতানিতে রয়েছে, 'সিয়াসত শুধু যিনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রত্যেক অপরাধের ক্ষেত্রেই বৈধ। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার ইমামুল মুসলিমীনের উপর ন্যস্ত। ... অতএব, সিয়াসত হচ্ছে- দুনিয়া ও আখেরাত উভয় বিষয়ে যে পথে মুক্তি মিলবে, সে পথের নির্দেশনা দানের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতকে যথোপোযুক্ত পরিচালনা করা।" (রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

ইমামুল মুসলিমিন বলতে শুধু তিনিই উদ্দেশ্য নন, বরং তার নিয়োগকৃত সুলতান, কাযি ও আমীর-উমারা সকলেই উদ্দেশ্য। সকলেই নিজ নিজ গণ্ডির ভেতর থেকে সিয়াসত প্রয়োগ করতে পারবেন। (দেখুন- রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

সিয়াসতের পরিধি অনেক বড়। ক্ষেত্র বিশেষে শরীয়তের ভিতরে থেকে কোন কোন বিষয়ে এবং কারো কারো ব্যাপারে একটু শিথিলতা অবলম্বন করতে হয়। এটাও সিয়াসত। যেমন- মুসলিম বাহিনি দারুল হরবে থাকাবস্থায় হদ কায়েম করতে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, দারুল হরবে যুদ্ধাবস্থায় একজন সৈনিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনেক। তার হাত কেটে দিলে বা পা কেটে দিলে মুসলমানদের দুর্বলতা আসবে। কাফেরদের শক্তি ও সাহস বাড়বে। অধিকন্তু যার উপর হদ কায়েম করা হয়েছে সে ক্ষোভের শিকার হয়ে কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে যেতে পারে। তখন হদ কায়েমটা কল্যাণের কারণ না হয়ে বরং অকল্যাণের কারণ হয়ে যাবে।

এখানে দারুল ইসলামে ফিরা পর্যন্ত হদ কায়েমে বিলম্ব করা হচ্ছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এটা কুরআনে কারিমের নির্দেশের পরিপন্থি- কেননা, কুরআনে কারিমে হদ কায়েমে বিলম্বের কথা নেই; কিন্তু শরীয়তের মূলনীতির আলোকে এটাই সিয়াসতের দাবি। কেননা, বিলম্ব করার দ্বারা হদও কায়েম করা যাচ্ছে এবং যে অকল্যাণ সাধিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাও প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে। তাই এখানে হদ কায়েম বিলম্ব করাটাই শরীয়তের দাবি।

যাহোক, বুঝানো উদ্দেশ্য- শরীয়তের ভিতরে থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু শিথিলতা অবলম্বন করাও সিয়াসতের অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে কঠোর বিধান আরোপ করাও সিয়াসতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- চোরের শাস্তি হল: প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কেটে দেয়া, দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে দেয়া। এ দু’টি শাস্তি হদ হিসেবে নির্ধারিত। তাই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। তৃতীয় বার ও চতুর্থ বার চুরি করলে কি শাস্তি (হানাফি মাযহাব মতে) তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। মুনাসিব মনে হলে জেলে ভরে রাখতে পারেন, আবার যথাক্রমে বাম হাত ও ডান পা কেটে দিতে পারেন। আবার মুনাসিব মনে

হলে হত্যাও করে দিতে পারেন। চুরির শাস্তি যদিও হত্যা নয়, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বার চুরি করলে হত্যা করা সিয়াসতের দাবি। কারণ, এ অবস্থায় সে আর স্বাভাবিক চোর থাকেনি, বরং মুফসিদ ফিল আরদ তথা যমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়েছে। তার কারণে জনগণের মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা একটা ফাসাদ। আর ফাসাদকারীকে হত্যা করে দেয়ার কথা কুরআনে কারীমে এসেছে, যেমনটা একটু আগে আয়াত উল্লেখ করেছি। তাই তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চোরকে হত্যা করে দেয়া শরীয়তের পরিপন্থি নয়, বরং এটাই শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির দাবি। এ চোরের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী সিয়াসত।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

عرفها بعضهم بأنها: "تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد"، وقوله: " لها حكم شرعي" معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصها؛ فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم، ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اهـ.

وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ، وهي نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرا من المظالم، وتردع أهل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها، وهي باب واسع ...الخ اهـ.

"কেউ কেউ সিয়াসতের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, তা হচ্ছে- 'ফাসাদের বীজ নির্মূলের উদ্দেশ্যে যেসব অপরাধে শরয়ী বিধান রয়েছে, সেগুলোতে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা।' তার বক্তব্যে 'শরয়ী বিধান রয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য- তা শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির আওতায় পড়ে, যদিও সরাসরি সে বিষয়ে শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট ভাষ্য নেই। কেননা, ঈমানের উসূল ও মূলনীতিসমূহের পর শরীয়তের ভিত্তি হল ফাসাদের বীজ নির্মূলের উপর, যেন জগত টিকে থাকতে পারে। এ জন্য আলবাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে, 'আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের ভাষ্য এই যে, সিয়াসত হল- বিচারকের এমন পদক্ষেপ যা তিনি মাসলাহাতের বিবেচনায় গ্রহণ করেছেন, যদিও উক্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে (শরীয়তে) প্রত্যক্ষ কোন দলীল নেই।'

মিসকিন রহ. এর হাশিয়াতে হামাবি রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'সিয়াসত হলো কঠোরতর বিধান। তা দুই প্রকার: ১.

জালেম সিয়াসত। শরীয়ত একে হারাম ঘোষণা করে। ২. আদেল তথা ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত, যা জালেম থেকে প্রাপ্য অধিকার আদায় করে, অনেক রকমের জুলুম প্রতিহত করে, ফাসাদকারীদের দমন করে এবং শরীয়তের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করে। শরীয়ত একে অবলম্বন করা এবং হক ও প্রাপ্য প্রমাণ করার জন্য এর উপর নির্ভর করা আবশ্যক করে। এটি এক ব্যাপক বিস্তৃত অধ্যায় ...।" (রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

মোটকথা- যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান নেই, সেগুলোতে শরীয়তের সার্বিক উসূল ও মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল- ইসলামী সিয়াসত। শরীয়তের সীমারেখার অভ্যন্তরে থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা করাও সিয়াসত, ফাসাদ ও ফাসাদকারীদের দমনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতর বিধান (এমন কি মৃত্যুদণ্ড) আরোপ করাও সিয়াসত। সিয়াসত একটি ব্যাপক-বিস্তৃত অধ্যায়। শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়েই এর আওতাধীন।

সিয়াসতরূপে হত্যা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, অনেক ক্ষেত্রে শরীয়ত সিয়াসত বা তা’যিররূপে হত্যার বৈধতা দিয়েছে।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

و يكون التعزير بالقتل. اهـ

“তা’যির হত্যার দ্বারাও হতে পারে।” [আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬২]

আমরা শুরুতে বলে এসেছি যে, সিয়াসতরূপে ঐসব ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, যারা সমাজে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে, যাদের ফলে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে, যাদের ফলে লোকজনের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে কিংবা দ্বীন বিকৃত হচ্ছে। এমন ধরণের ব্যক্তিদেরকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে। অন্যথায় যাদের অপরাধের দ্বারা কেবল অপরাধী নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধের ফলে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না- তাদের হত্যা করা হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি রোযা রাখে না। কিন্তু সে অন্য কাউকে রোযা না

রাখার দাওয়াত দেয় না। তাকে রোযা না রাখলে বন্দী করা হবে, শাস্তি দেয়া হবে; কিন্তু হত্যা করা হবে না। কেননা, রোযা না রাখার ক্ষতি তা তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এর দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। পক্ষান্তরে কট্টর বিদআতি, যে নিজ বিদআতের দিকে অন্যদের আহ্বান করে থাকে- তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, তারা দ্বারা লোকজনের দ্বীন বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তদ্রূপ, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, লুটেরা, খুনি, ধর্ষক, সমকামি- এসব লোকের দ্বারা সমাজ বিনষ্ট হচ্ছে, জনশান্তিতে বিঘ্ন ঘটছে। তাই এরা যখন এসব অপরাধ বার বার করতে থাকবে, তখন তাদের হত্যা করে দেয়া হবে।

'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকারের উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت

اهـ ... ومن ذلك ما سيذكره .بالتكرار وشرع القتل في جنسها المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرر منه.

وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. اهـ كلام ابن عابدين رحمه الله

"হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আসসারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে দেখেছি: [হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো- তাদের মতে যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়; যেমন: ভারি বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য পথে সঙ্গম করা; যদি ব্যক্তি থেকে তা একাধিকবার প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করতে পারবেন। তদ্রূপ মাসলাহাত মনে করলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ সকল অপরাধের বেলায় বর্ণিত হত্যাকে তারা এর উপর প্রয়োগ করেন যে, এতে তিনি মাসলাহাত রয়েছে মনে করেছেন। একে তারা 'সিয়াসতরূপে হত্যা' নাম দিয়ে থাকেন। এর সারকথা: যেসব অপরাধের অনুরূপ অপরাধে হত্যার বিধান রয়েছে, সেগুলো যখন বারংবার সংঘটিত হওয়ার দ্বারা

গুরুতর অবস্থা ধারণ করবে, তখন সেগুলোতে তিনি তা'যিররূপে হত্যা করতে পারবেন।] হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য শেষ হল। ...

(শামী রহ. বলেন,) গ্রন্থকার সামনে যা উল্লেখ করবেন, সেটাও এই শ্রেণীভুক্তই। তা হল- ইমামুল মুসলিমীন সিয়াসতরূপে চোরকে হত্যা করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন তার থেকে বারংবার চুরি প্রকাশ পাবে। কিতাবুল জিহাদের একটু আগে আলোচনা আসবে যে, যে ব্যক্তি থেকে শহরের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা বারংবার ঘটবে, তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার অবস্থা এমন হবে- তাকে হত্যা করে দিয়ে তার অনিষ্ট দমন করা হবে। বাবুর রিদ্দাহয় আলোচনা আসবে- যাদুকর কিংবা এমন যিন্দিক, যে নিজ কুফরি অভিমতের দিকে লোকজনকে দাওয়াত দেয়: যদি তাওবা করার আগেই ধৃত হয় এরপর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর তাওবা করার পর ধৃত হলে তাওবা কবুল হবে। সামনে এও আসবে যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর কোন তাওবার সুযোগ নেই। আর সমকামিকে তা'যিররূপে কিভাবে হত্যা করা হবে তার আলোচনা আগে গেছে।" (রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২-৬৩)

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৫

বি.দ্র.-১: এক অপরাধ কতবার করলে ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে?

এটি অপরাধের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- চুরির ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয়বার চুরি করাটা ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হয় না। এ দুই বারের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত যা সুনির্ধারিত। তৃতীয় বা চতুর্থ বার চুরি করা ফাসাদ ফিল আরদ বলে গণ্য। তখন মুনাসিব মনে হলে ইমামুল মুসলিমীন চোরকে হত্যা করতে পারেন।

অপর দিকে কাউকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা দ্বিতীয় বারেই ফাসাদ ফিল আরদ বলে গণ্য। কাজেই কারো থেকে একাধিক বার শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার অপরাধ পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে।

এক কথায় বলা যায়- যেখানে হদ নির্ধারিত আছে, সেখানে হদ কায়েম করা হবে। হদের সীমা পেরিয়ে গেলে তখন (যেমন তৃতীয় বার চুরি করা) ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে। আর

যেখানে হদ নেই সেখানে একাধিক বার পাওয়া গেলে (যেমন একাধিক বার শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা) ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে।

বি.দ্র.-২: ফাসাদকারীদেরকে অপরাধে লিপ্ত থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় হত্যা করা হবে

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, দফউস সায়েলরূপে যাদের হত্যা করা হবে, তাদেরকে কেবল তখনই হত্যা করা হবে, যখন তারা অপরাধে লিপ্ত থাকে এবং হত্যা ব্যতীত তাদের থেকে জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা সম্ভব না হয়। অপরাধ থেকে নিবৃত হয়ে গেলে আর হত্যা করা যাবে না। তখন শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোকে যে অপরাধ প্রমাণিত হবে সে হিসেবে হদ-কেসাস বা অন্য শাস্তি কায়েম করা হবে।

এ আলোচনা থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, অপরাধে লিপ্ত থাকাবস্থা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় কাউকে হত্যা করা যাবে

না। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। যারা ফাসাদকারীরূপে চিহ্নিত হয়ে যাবে, তাদেরকে যেকোনো অবস্থায় হত্যা করা যাবে- চাই অপরাধে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন ধরুন, এক লোক প্রসিদ্ধ সন্ত্রাস। সে ফাসাদকারীরূপে চিহ্নিত। সে হত্যার উপযুক্ত। এমতাবস্থায় তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা যাবে। বাড়িতে কি বাড়ির বাইরে, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার যেখানে যে অবস্থায়ই পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে।

যেমন ধরুন- সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি অনিষ্টকর প্রাণী। এদেরকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। এ অপেক্ষায় থাকা হবে না যে, সাপ-বিচ্ছু কামড় দিতে শুরু করলে বা ইঁদুর কাটতে শুরু করলে তখন হত্যা করা হবে, এর আগে হত্যা করা হবে না। কারণ, এদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ফাসাদ দূরীকরণের জন্য। এরা যদি বর্তমানে ফাসাদে লিপ্ত নাও থাকে, তবুও তাদের ব্যাপারে জানা কথা যে, তারা অচিরেই ফাসাদ করে বেড়াবে। ভবিষ্যতে তাদের থেকে যে ফাসাদের আশঙ্কা, সেটাকে প্রতিহত করতেই তাদের হত্যা করা হচ্ছে। এ আশঙ্কা তাদের থেকে সর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান। বাড়িতে

থাকলেও, গাড়িতে থাকলেও। হাটে থাকলেও, ঘাটে থাকলেও। ঘুমে থাকলেও, জাগ্রত থাকলেও। এ জন্য এদের ব্যাপারে কোন পরোয়া নেই। যখন যেখানেই সুযোগ মিলবে হত্যা করে দেয়া হবে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فإن قيل: فما تقولون في السنور إذا أكلت الطيور، وأكفأت القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ... لأنها في معنى الكلب العقور ... وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرا: فلا ضمان.
فإن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟ قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.
وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية: إنما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأما في حال سكونها وعدم صولها: فلا.
والصحيح: خلاف ذلك، وأنها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الفساد والأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته ...
وفي " الصحيحين " عنه - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والفأرة، والحية، والغراب العقرب " بدل " الحية " " الأبقع، والكلب العقور» وفي لفظ ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة. اهـ

“যদি প্রশ্ন করা হয়- বিড়াল যদি পাখি খেয়ে ফেলে এবং ডেগ-পাতিল উল্টে ফেলে তাহলে এর (জরিমানার ব্যাপারে) আপনারা কি বলেন? উত্তর হবে- (যদি অনিষ্টসাধন করা ঐ বিড়ালের অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে) বিড়াল পালককে নষ্টকৃত জিনিসের জরিমানা দিতে হবে। ... কেননা, এ বিড়াল ঐ কুকুরের মতো, দংশন করা যার স্বভাব। ... আর যদি এমনটা এর অভ্যাস না হয়ে থাকে, বরং ঘটনাক্রমে করে ফেলেছে, তাহলে জরিমানা দিতে হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়- এ অপরাধের কারণে কি আপনারা একে মেরে ফেলার অনুমতি দেন? উত্তরে বলব, হ্যাঁ (মেরে ফেলা যাবে)- যদি এমনটা করা এর অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। তবে ইবনে আকীল রহ. এবং শাফিয়ি মাযহাবের কেউ কেউ বলেন, অনিষ্টে লিপ্ত থাকাবস্থায় হত্যা করা যাবে। নিবৃত থাকাবস্থায় এবং আক্রমণ না করাবস্থায় হত্যা করা যাবে না।

তবে সঠিক কথা হল এর বিপরীতটা। নিবৃত থাকাবস্থায়ও একে হত্যা করা যাবে; যেমন- *ফাসাদ করে বেড়ানো এবং কষ্ট দেয়া যে লোকের অভ্যাস, তাকে নিবৃত থাকাবস্থায়ও হত্যা*

করা যাবে। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা হবে না। ...

সহীহাইনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে- 'পাঁচটি ফাসেক প্রাণী আছে, যেগুলোকে হরম শরীফ কি হরমের বাইরে সবখানে হত্যা করা হবে। সেগুলো হল: চিল, ইঁদুর, সাপ, পেটে বা পিটে সাদা দাগবিশিষ্ট কাক এবং ঐ কুকুর, দংশন করা যার স্বভাব।' অন্য বর্ণনায় সাপের বদলে বিচ্ছুর কথা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের হত্যার জন্য হত্যা অনিষ্টে লিপ্ত থাকাবস্থায় হওয়ার শর্ত করেননি।" **(আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ২৪১-২৪২)**

হাদিসে যে পাঁচটি প্রাণীর কথা বলা হয়েছে, শুধু সেগুলোই নয়; যে প্রাণীই কষ্টদায়ক হবে- তাকেই হত্যা করে দেয়া হবে। যেখানে যে অবস্থায়ই পাওয়া যাবে, হত্যা করে দেয়া যাবে। হাদিসে এ পাঁচটি উল্লেখ করে এ দিকেই ঈঙ্গিত করা হয়েছে। যাহোক, বুঝানো উদ্দেশ্য- ফাসাদকারী যেই হবে, তাকেই হত্যা করা। যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে- হত্যা করে দেয়া হবে। ফাসাদকারী মানুষ হোক কি অন্য কোন প্রাণী হোক। ফাসাদকারী যদি মানুষ হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়ার

বিষয়টি সুবিদিত। এ কারণেই ইবনুল কায়্যিম রহ. বিড়াল হত্যা বুঝাতে গিয়ে মানুষ হত্যার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং এর উপর বিড়ালকে কিয়াস করেছেন।

কতক ব্যক্তির অভ্যাস এমন যে, তারা জালেম শাসকদের দরবারে গিয়ে লোকজনের ব্যাপারে বানিয়ে চিনিয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। এদের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে শাসকরা নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে। এসব লোকও ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও হত্যাযোগ্য। এদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة - {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: 28]- كما نشاهد. قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ

“শাইখুল ইসলাম রহ.কে শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারী এবং জালেমদেরকে বিরতিকালীন সময়ে (হত্যার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।’ এর উপর প্রশ্ন করা হল- বিরতিকালীন সময়ে তো তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং আত্মগোপনে থাকে? তিনি উত্তর দেন: ‘এ বিরত থাকা তো জরুরতের কারণে। ***যদি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হত, তাহলে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে তারা পুনর্বার তাতেই লিপ্ত হতো।*** [আনআম: ২৮] যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, শায়খ আবু সুজা রহ.কে আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দেন: একে হত্যা করা বৈধ এবং তার হত্যাকরী সওয়াবের অধিকারী হবে।”
(রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪)

মোটকথা: যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা বেড়ায়, তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা যাবে- চাই তারা সে সময়ে ফাসাদে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক।

বি.দ্র.-৩: ফাসাদকারী যদি তাওবা করে

ফাসাদকারীদের উক্ত বিধান হল যখন তারা তাওবা করে ভাল না হবে। কিন্তু যদি তাওবা করে ফেলে এবং ফাসাদ পরিত্যাগ করে সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিধান কি হবে?

উত্তর: তাওবা হয়তো পাকড়াও করার আগে হবে, নয়তো পরে হবে। কোন কোন ফাসাদকারী এমন আছে যে, পাকড়াও করার আগে তাওবা করলে মাফ পেয়ে যাবে কিন্তু পাকড়াও করার পর তাওবা করলেও মাফ নেই। আবার কোন কোন ফাসাদকারী এমন আছে, তাদেরকে কোন অবস্থায়ই মাফ করে হবে না। আগে তাওবা করলেও তাদের বিধান- হত্যা। অবশ্য এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা আসবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৬

সিয়াসতরূপে যাদের হত্যা করা হবে

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সিয়াসতরূপে অনেকেই হত্যার পর্যায়ে পড়ে। যথা:

১. যাদুকর।

২. বিদআতিদের সর্দার।

৩. যিন্দিক।

৪. সমকামী।

৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করে।

৭. চোর।

৮. রাহজান ও ডাকাত।

৯. শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।

১০. ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী।

১১. মদখোর।

১২. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৭

এক. যাদুকর

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদা হল, যাদুর হাকিকত-বাস্তবতা রয়েছে। এর দ্বারা লোকজনের ক্ষতি করা সম্ভব। যাদু এমন জিনিস যা শিখা ও শিখানো যায়। তবে তা শিখা বা শিখানো হারাম। তবে বিশেষ জরুরতের দুয়েক ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত।

সকল যাদুকরই কি কাফের?

যাদুকর মাত্রই কাফের কি'না এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামে দ্বিমত রয়েছে:

- কারো কারো মতে যাদু বিদ্যা কুফর এবং প্রত্যেক যাদুকরই কাফের।

- কারো মতে (যেমন ইমাম শাফিয়ি রহ.) যদি যাদুতে কোন কুফরি বিশ্বাস, কথা বা কাজ থাকে তাহলে কাফের, অন্যথায় কাফের নয়।

যাদুকরের শাস্তি: হত্যা

যাদুকর তার যাদুর দ্বারা লোকজনকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাই সে মুফসিদ ফিল আরদ তথা সমাজে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এদের শাস্তি হল- পাকড়াও হওয়ার আগেই যদি যাদু পরিত্যাগ করে তাওবা করে ভাল হয়ে যায়, তাহলে মাফ পাবে। আর যদি তাওবা করে ভাল হয়ে যাওয়ার আগেই পাকড়াও করা হয়, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে। পাকড়াও হওয়ার পর তাওবা করলেও মাফ করা হবে না। অবশ্য খালেস দিলে তাওবা করলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পাবে।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

الساحر ... (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو (إذا أخذ) أخذ بعدها قبلت. اهـ

“যাদুকর ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর যদি তাওবার পর ধৃত হয়, তাহলে তাওবা কবুল হবে (হত্যা করা হবে না)।”

(‘আদদুররুল মুখতার’- রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা: ৪/২৪২)

উল্লেখ্য, যাদুকর মুসলিম হোক কি অমুসলিম, মুসলিম হলে যাদুর দ্বারা কাফের হোক বা না হোক, পুরুষ হোক কি নারী- সর্বাবস্থায় তার শাস্তি: হত্যা। মুসলিম, কাফের, মুরতাদ; মহিলা, পুরুষ- সকলের বিধান এক তথা হত্যা।

মুরতাদ যাদুকর সাধারণ মুরতাদের মতো নয়

সাধারণ মুরতাদের বিধান হল, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেয়া। এর মধ্যে মুসলমান হয়ে গেলে মাফ পেয়ে যাবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু মুরতাদ যাদুকরের বিধান ব্যতিক্রম। তার কাছে তাওবা তলব করা হবে না। পাকড়াও করার পর অবশ্যই হত্যা করে দিতে হবে।

মুরতাদ যদি মহিলা হয় তাহলে হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হয় না, বন্দী করে রেখে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু মহিলা যদি যাদুকর হয় এবং যাদুর দ্বারা মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হবে। তার বিধান সাধারণ

মুরতাদ মহিলার মতো নয়। কারণ, তাকে মূলত হত্যা করা হচ্ছে ইরতিদাদের কারণে নয়, বরং তার যাদুর কারণে।

মোটকথা- মুরতাদ যদি যাদুকর হয়, তাহলে পাকড়াও করার পর তাকে আর মাফ করা হবে না। কারণ, সে সাধারণ মুরতাদ নয় বরং ফাসাদকারী মুরতাদ। সাধারণ মুরতাদরা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে মাফ করার সুযোগ আছে, কিন্তু ফাসাদকারী মুরতাদরা তাওবা করে ভাল হয়ে গেলেও মাফ পায় না। পাকড়াওয়ের পর মুফসিদ মুরতাদের শাস্তি হদের মতো। হদ যেমন মাফ হয় না, এদের শাস্তিও তেমন মাফ হয় না।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

وحكى محمد بن شجاع عن أبي علي الرازي قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر "يقتل ولا يستتاب" لم لم يكن ذلك بمنزلة المرتد؟ فقال: الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد. اهـ

“মুহাম্মাদ ইবনে সুজা রহ. আবু আলী রাযি রহ. থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, যাদুকরের ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এর অভিমত ‘তাওবা তলব করা ব্যতীতই তাকে হত্যা করে দেয়া হবে’- এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার বিধান সাধারণ মুরতাদের বিধানের মতো হল না কেন? তিনি উত্তর দেন- কারণ, যাদুকর কাফের হওয়ার পাশাপাশি যমিনে ফাসাদ সৃষ্টিরও সমন্বয় ঘটিয়েছে।” **(আহকামুল কুরআন: ১/৬১)**

তিনি আরও বলেন,

ويستدل بظاهر قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] إلى آخر الآية، على وجوب قتل الساحر حدا; لأنه من أهل السعي في الأرض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ما صار إليه من الكفر. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায় ... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)’- এর ভাষ্য থেকে এ ব্যাপারে দলীল দেয়া যায় যে, যাদুকরকে হদরূপে হত্যা করা ফরয। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে যাদু করে। লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে। তাদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে।

পাশাপাশি যে কুফরিতে সে নিপতিত হয়েছে তা তো আছেই।”
(আহকামুল কুরআন: ১/৬৫)

যেসব যাদুকর মুরতাদ হয়ে যায়নি, তাদেরও শাস্তি- পাকড়াওয়ের পর হত্যা। কারণ, সে মুরতাদ না হলেও মুফসিদ ফিল আরদ, যার শাস্তি হত্যা।

ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

لا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله؛ لأن قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر: يقتل دفعا لشره كالخناق وقطاع الطريق. اهـ

“অনেক সময় যাদুকর কাফের হয় না- এর অর্থ এই নয় যে, তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, তাকে হত্যা করা হচ্ছে যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর কারণে- যেমনটা আগেও অতিবাহিত হয়েছে। অতএব, যখন প্রমাণিত হবে যে, সে যাদুর দ্বারা লোকজনের ক্ষতি করে- যদিও তা কুফরির দ্বারা না হয়: তখন তার অনিষ্ট দমনার্থে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। যেমন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারী ও রাহজানদের হত্যা করা হয়।”
(রদ্দুল মুহতার: ১/৪৫)

যাদুকরদের সাথে সাহাবা তাবিয়িগণের আচরণ

সাহাবা ও তাবেয়িগণ যাদুকরদের হত্যা করে দিতেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে এসেছে,

عن عمرو ؛ سمع بجالة ، يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية ، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال :. فقتلنا ثلاث سواحر

“বাজালা রহ. বলেন, আমি জায ইবনে মুআবিয়ার কেরানী ছিলাম। তখন আমাদের নিকট হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র আসল এই মর্মে যে, ‘প্রতিটি যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করে দাও।’ তিনি বলেন, তখন আমরা তিনটি যাদুকরকে (পেয়ে) হত্যা করে দিলাম।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮৫)

عن ابن عمر ؛ أن جارية لحفصة سحرتها ، ووجدوا سحرها ، واعترفت ، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها

“ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক বাঁদি তাকে - হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে- যাদু করেছিল। তারা উক্ত বাঁদির যাদুর প্রমাণ

পেল। বাঁদিও যাদুর কথা স্বীকার করল। তখন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদকে আদেশ দেন বাঁদিটিকে হত্যা করে ফেলতে। ফলে তিনি একে হত্যা করে দেন।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮৩)

عن همام بن يحيى ؛ أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذها ، فكتب إليه عمر : إن اعترفت ، أو قامت عليها البينة ، فاقتلها.

“হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন, উম্মানের গভর্নর এক যাদুকর মহিলাকে গ্রেফতার করে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর কাছে এর বিধান জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. লিখে পাঠান, ‘যদি মহিলা যাদুর কথা স্বীকার করে বা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে তার যাদু প্রমাণিত হয়, তাহলে একে হত্যা করে দাও।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮২)

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وقال أصحابنا: للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام خلافا لمن منع ذلك وقال إنما هو تخييل. وتعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر

الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو لا ويقتل. وقد روي عن عمر وعثمان وابن عمر وكذلك عن جندب بن عبد الله وحبيب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز فإنهم قتلوه بدون الاستتابة. اهـ

“আমাদের আইম্মায়ে কেরামের অভিমত হল, যাদুর হাকিকত-বাস্তবতা রয়েছে (তা কেবল চোখের ধাঁ-ধাঁ নয়) এবং শারীরিক কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে। তবে কেউ কেউ তা মানতে চান না বরং বলেন, তা কেবল চোখের ধাঁ-ধাঁ। আহলে ইলমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, যাদু শিক্ষা দেয়া হারাম। একে বৈধ জ্ঞান করা কুফর। আমাদের আইম্মায়ে কেরাম, মালেক ও আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, যাদুকর যাদু শিখা এবং তা প্রয়োগের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করে দেয়া হবে- চাই তা হারাম জ্ঞান করুক বা না করুক। উমর, উসমান ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এমনই বর্ণিত আছে। তদ্রূপ, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ, হাবিব ইবনে কা’ব, কাইস ইবনে সা’দ এবং উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এমনই বর্ণিত আছে। কেননা, তারা একে -যাদুকরকে- তাওবা তলব করা ব্যতীতই হত্যা করে দিয়েছেন।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সামনে গিয়ে বলেন,

وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته ... ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه. وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. اهـ

“তবে শাফিয়ি রহ. এর অভিমত হল, একে বৈধ জ্ঞান না করলে হত্যা করা হবে না এবং সে কাফেরও হবে না। ... যাদুকর ও গণকের কাফের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ি রহ. এর অভিমত ছেড়ে অন্য কোন অভিমতের দিকে না যাওয়া আবশ্যক। তবে (তার হত্যার বিষয়ে শাফিয়ি রহ. এর অভিমত গ্রহণ করা হবে না, বরং) যাদু চর্চার বিষয়টা প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করে দেয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে তার থেকে তাওবা তলব করা হবে না। যদি তার মাঝে কোন কুফরি আকিদা না থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে শুধু যাদুর কারণে নয়, বরং যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর কারণে।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সারকথা-

যাদুতে কোন কুফরি কথা, কাজ বা বিশ্বাস থাকলে তা সর্বসম্মতিতে কুফর এবং যাদুকর (আগে মুসলিম থেকে থাকলে এখন) কাফের। আর কুফরি কিছু না থাকলে অনেকের মতে কাফের আর কারো কারো মতে কাফের নয়। তবে কুফরি থাকুক বা না থাকুক, কাফের হোক বা না হোক- তাওবার আগে পাকড়াও হলে সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করে দিতে হবে। যাদুকর মুসলিম হোক বা কাফের হোক, মুসলিম হয়ে থাকলে যাদুর দ্বারা মুরতাদ হোক বা না হোক, পুরুষ হোক কি মহিলা- সর্বাবস্থায় তার বিধান: তাওবার আগে পাকড়াও হলে হত্যা। কারণ, সে মুফসিদ ফিল আরদ তথা

যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী। আর মুফসিদের ক্ষেত্রে কাফের-মুসলিম, পুরুষ-মহিলা, স্বাধীন-গোলাম সবার হুকুম সমান।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৯

যিন্দিকের শাস্তি:

মুসলিম বেশধারী যিন্দিক যদি ধৃত হওয়ার আগেই তাওবা করে ভাল হয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার তাওবা কবুল হবে। ফলে তার উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে মুসলমান গণ্য হবে। যেমন সাধারণ মুরতাদরা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয় এবং তাদের উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসলিম পরিচয়ধারী কোন ব্যক্তি গোপনে গোপনে কাফের কি'না তা জানার পথ নেই। তাই কোন যিন্দিক ধৃত হওয়ার আগে তাওবার সূরত এ হবে যে, সে স্বেচ্ছায় কাযি বা ইমামুল মুসলিমিনকে জানাল, এতদিন সে কাফের ছিল। এখন তাওবা

করে বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে। তাহলে সে মাফ পেয়ে যাবে। কারণ, স্বেচ্ছায় নিজের অবস্থা প্রকাশ করে তাওবা করা থেকে বুঝা যায়, সে বাস্তবেই তাওবা করেছে।

পক্ষান্তরে যদি শরয়ী দলীল প্রমাণ দিয়ে তার কুফর প্রমাণ হয় এবং তারপর ধৃত হয়ে কাযির দরবারে উপস্থিত হয়, তাহলে তখন তার তাওবা (ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও, দুনিয়ার বিচারে) গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে বাস্তবে তাওবা করেনি, হত্যা থেকে বাঁচার জন্য তাওবা জাহির করছে; যেমন এতদিন নিজেকে বাঁচানোর জন্য মুসলমান দাবি করে এসেছে।

সংশয়:

এখানে সংশয় হতে পারে যে, দারুল হরবে কাফেরদের উপর হামলা করলে যদি তারা তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয়; তাহলে এখানে যিন্দিক ব্যক্তি তরবারির ভয়ে তাওবা করলে মাফ পাবে না কেন?

নিরসন:

হরবিরা এতদিন ইসলামের সাথে সুস্পষ্ট দুশমনি প্রকাশ করে আসছিল। এখন যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন স্বাভাবিক এটাই যে, তারা তাদের আগের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী বিশ্বাস ধারণ করেছে। কিন্তু যিন্দিক এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতদিন সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য –কাফের হওয়া সত্ত্বে- মুসলমান দাবি করে আসছিল। এখন ধরা পড়ার পর যখন নিজেকে মুসলমান দাবি করছে, তখন সে অতিরিক্ত কিছু করেনি, আগে যেমন মুসলমান দাবি করছিল, এখনও তেমনই দাবি করছে। আর তার কুফরি আকীদা থেকে ফিরে আসার দাবি যা সে করছে, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে তরবারির ভয়ে শুধু জাহির করছে, বাস্তবে কুফর পরিত্যাগ করছে না। কেননা, এতদিন- কাফের হওয়া সত্ত্বে- নিজেকে বাঁচানোর জন্য শুধু মুসলমান দাবি করতো। এখন ধরা পড়ার পর তার আগের কুফর ছেড়ে দেয়া নিশ্চিত নয়। বরং প্রবল ধারণা এটাই যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এত দিনের মতো এখনও তাওবা জাহির করছে। পক্ষান্তরে হারবি কাফেররা নিজেদেরকে স্পষ্ট কাফের দাবি করে আসছিল। নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি কোন স্বার্থে নিজেদের মুসলমান

দাবি করার কোন প্রমাণ তাদের থেকে নেই। তাই তাদের বেলায় এ সম্ভাবনা প্রবল যে, তারা বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে।

অন্য কথায় বলা যায়, যার জাহির তার বাতিনের বিপরীত প্রমাণিত হবে, দুনিয়ার বিচারে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়- যদিও ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে যাদের বাতিন তাদের জাহিরের অনুরূপ, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও বিভিন্ন কারণ আছে। সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

দলীল-প্রমাণ ও আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য:

আল্লামা কাশ্মিরি রহ. (১৩৫২হি.) তার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ইকফারুল মুলহিদিন' এ বলেন,

قال: التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين": الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم "المنافق"، وإن كفر بعد الإسلام "فبالمرتد"... وإن أبطن عقائد هي كفر بالإتفاق "فبالزنذيق"".

وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" اسم لمن لا إيمان له: فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد، لرجوعه عن الإسلام ... وإن كان مع اعترافه وإظهاره شعائر الإسلام - بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق، خص باسم الزنيدق. اهـ

"'মাকাসিদুত ত্বালিবিন ফি উসূলিদ দ্বীন' গ্রন্থে তাফতাযানি রহ. (৭৯২হি.) বলেন, কাফের যদি নিজেকে মু'মিন জাহির করে, তাহলে তাকে 'মুনাফিক' বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর কাফের হয়, তাহলে বলা হবে 'মুরতাদ'। ... আর যদি গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে 'যিন্দিক'।

তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন: এতক্ষণে স্পষ্ট হল যে, ‘কাফের’ হচ্ছে এমন ব্যক্তির নাম, যার ঈমান নেই। যদি সে নিজেকে মু’মিন জাহির করে তাহলে ‘মুনাফিক’ বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তাহলে বলা হবে ‘মুরতাদ’ তথা দ্বীনত্যাগী । কেননা, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে। ... যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত স্বীকার করা এবং শাআয়েরে ইসলাম প্রকাশ্যে জাহির করা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে ‘যিন্দিক’।”

(ইকফারুল মুলহিদিনি: ১২-১৩)

অন্যত্র বলেন,

المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له، لا ظاهراً ولا باطناً فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن حق، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة: الابتهاج الذي يحصل بسبب

الملكات المحمودة، والمراد بالنار: هي الندامة التي تحصل بسبب

الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار فهو زنديق.
اهـ

“দ্বীনে হকের বিরোধী ব্যক্তি যদি জাহিরি বাতিনি কোনভাবেই তা স্বীকার না করে এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সে ‘(প্রকাশ্য) কাফের’। যদি যবান দিয়ে তো স্বীকার করে কিন্তু তার অন্তর কুফরে অটল, তাহলে ‘মুনাফিক’। আর যদি বাহ্যত স্বীকার করে কিন্তু জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কিছু বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে, যা সাহাবা-তাবেয়ীন যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উম্মাহ যে ব্যাখ্যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে সে ব্যাখ্যার বিপরীত: তাহলে সেই হচ্ছে ‘যিন্দিক’। যেমন: স্বীকার করলো যে, কুরআন সত্য এবং তাতে বিধৃত জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য; কিন্তু জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য- প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে অর্জিত প্রশান্তি, আর জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য- নিন্দনীয় স্বভাবের কারণে উদ্ভূত অনুতপ্ততা; বাস্তবে কোন জান্নাত বা কোন জাহান্নাম নেই: তাহলে সে ‘যিন্দিক’।” **(ইকফারুল মুলহিদিনি: ৪৪)**

কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্যের সারকথা- মুসলমান দাবিদার যে

ব্যক্তি অন্তরে কুফর পোষণ করে (কিন্তু তার কুফর জনসম্মুখে প্রকাশ পায় না) সে মুনাফিক। আর যে মুসলমান দাবি করার পরও গোপনে গোপনে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে কিংবা জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে যা সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী: সে যিন্দিক।

উল্লেখ্য, কাশ্মিরি রহ. এখানে যিন্দিকের ব্যাপক ও সামাজিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা, যদি মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা করতে থাকে, তাহলে ফিকহের পরিভাষায় সে সুস্পষ্ট মুরতাদ গণ্য হবে। সামাজিকভাবে তাকে যিন্দিক বলা হলেও তার উপর মুরতাদের বিধানই প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যদি সে তার এসব কুফরি আকীদা পরিত্যাগ করে সত্য ইসলামে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে যেমন তার তাওবা কবুল হবে, দুনিয়াতেও সে হত্যা থেকে বেঁচে যাবে। যেমন- ঐসব কাদিয়ানি ও শীয়া, যারা নিজেদের কুফরি আকীদা সুস্পষ্টই প্রকাশ করে থাকে। কাদিয়ানিরা শেষ নবীর অর্থের অপব্যাখ্যা করে থাকে। শীয়ারা কুরআন মানে কিন্তু ভিন্ন কুরআন। এরা

সামাজিকভাবে যিন্দিক হলেও ফিকহের ভাষায় মুরতাদ। এরা তাওবা করলে মাফ পাবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, প্রকাশ্যে তাদের থেকে কোন কুফর প্রকাশ না পায, কিন্তু গোপনে গোপনে এসব অপব্যাখ্যা ও কুফরী আকীদা পোষণ করে; ঘটনাক্রমে বা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো নিকট প্রকাশ করার দ্বারা তা প্রকাশ পায়: তাহলে ফিকহের পরিভাষায় তারা যিন্দিক। এদের বিধান সাধারণ মুরতাদের থেকে ভিন্ন।

অন্য কথায় বলা যায়, যিন্দিক মূলত মুনাফিক। কিন্তু ঘটনাক্রমে যার কুফর প্রকাশ হয়ে যাবে- কিন্তু সে অস্বীকার করতে থাকবে যে, সে কাফের না বা কোন কুফরি আকীদা পোষণ করে না- সে যিন্দিক। পক্ষান্তরে যে প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, সে যিন্দিক নয়, মুরতাদ। সামাজিকভাবে ব্যাপক অর্থে ক্ষেত্রবিশেষে তাকে যিন্দিক বলা হলেও ফিকহের ভাষায় সে মুরতাদ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبى صلى الله عليه و سلم وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره. اهـ

"এসকল ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় যিন্দিক হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুনাফিক। আর তা হচ্ছে, বাহ্যত মুসলমান জাহির করা কিন্তু অন্তরে ভিন্ন কিছু পোষণ করা।" **(মাজমুউল ফাতাওয়া: ৭/৪৭২)**

অর্থাৎ এই মুনাফিকের কুফর যখন তার অসতর্কতাবশত ঘটনাক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন সে যিন্দিক।

যিন্দিক বাহ্যত যেটাকে নিজের দ্বীন বলে প্রকাশ করছে, বাস্তবে সেটা তার দ্বীন নয়। বরং সে এর বিপরীত আকীদা রাখে। এ কারণে তাকে 'বে-দ্বীন'ও বলা হয়। এ হিসেবে ইবনুল ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو من لا يتدين بدين. اهـ

“যিন্দিক হচ্ছে যার কোন দ্বীন নেই (তথা বেদ্বীন)।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

যিন্দিকের কুফর প্রকাশ কিভাবে হবে, এ সম্পর্কে বলেন,

فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه. اهـ

“তার অবস্থা সম্পর্কে অবগতির পন্থা হল- হয়তো কোন মুসলমান ঘটনাক্রমে তা জেনে ফেলবে, নতুবা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো কাছে গোপনে তা প্রকাশ করবে।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

বুঝা গেল, যে যিন্দিকের শাস্তি সাধারণ মুরতাদের চেয়ে ভিন্ন, যার তাওবা দুনিয়ার বিচারে কবুল হবে না, সে হল ঐ যিন্দিক, যে গোপনে গোপনে কুফরি পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, তারা মুরতাদ। তারা তাওবা করলে তাওবা কবুল হবে। ফলে তাদের উপর মুরতাদের শাস্তি বর্তাবে না। যেমন হরবি কাফেররা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয়।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

والحق أن الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المنافق، فالزنديق إن كان حكمه كذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره ... ويظهر تدينه بالإسلام ... وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة. اهـ

“বাস্তব কথা হচ্ছে, যাকে (অবশ্যই) হত্যা করে দেয়া হবে এবং তার তাওবা কবুল করা হবে না, সে হচ্ছে মুনাফিক। যিন্দিকের বিধান যদি এমনই হয়, তাহলে তার বেলায় আবশ্যক যে, সে তার কুফর গোপন করে ... এবং বাহ্যত নিজেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দাবি করে। ... অন্যথায় যদি ধরে নিই যে, সে তার কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়, তাহলে তাওবা করলে তাকে হত্যা না করা এবং তার তাওবা কবুল করা আবশ্যক। যেমন, অন্য সকল কাফের, যারা নিজেদের কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়- যখন তারা তাওবা করে (তখন তাদের তাওবা গ্রহণ করা হয়)।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সারকথা দাঁড়াল:

- যারা হরবি কাফের, তারা যখন তাওবা করে মুসলমান হয়ে

যাবে, তাদের তাওবা আখেরাতে যেমন কবুল হবে, দুনিয়াতেও হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যারা সুস্পষ্ট মুরতাদ, তারা যদি তাওবা করে, তাহলে তাদের তাওবাও আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও কবুল হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যাদের বাতিন তাদের জাহিরের বিপরীত- অর্থাৎ যিন্দিক- যারা বাস্তবে কাফের কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি সুবিধা লাভের জন্য বা ছদ্মবেশে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, দুনিয়ার বিচারে তাদের তাওবা কবুল হবে না। ফলে অবশ্যই তাদের হত্যা করা হবে। তবে ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে মাফ পেয়ে যাবে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২০

অনেক দিন যাবৎ কাজটা বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিকে আবার শুরু হল।

যিন্দিকের আলোচনা চলছিল। কিছু আলোচনা হয়েছিল। বাকি অংশ আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। যিন্দিক ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলেও তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না, বরং হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, খালেস নিয়তে তাওবা করলে আখেরাতে

আল্লাহ তাকে মাফ করবেন- সেটা ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত দলীল আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ধৃত হওয়ার পর দুনিয়াতে যিন্দিকের তাওবা কবূল না হওয়ার দলীল:

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا} [التوبة: 52] قال السلف بالقتل إن أظهرتم ما في [في هذه الآية: {أو بأيدينا} [التوبة: 52 قلوبكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. اهـ [إعلام الموقعين: 3\107]

"ধৃত হওয়ার পর যিন্দিকের তাওবা তার রক্তের সুরক্ষা না হওয়ার একটি দলীল আল্লাহ তাআলার এ বাণী,

{ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}

“আপনি (মুনাফিকদের) বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে (বিজয় ও শাহাদাত এ) দু’ কল্যাণের কোনো একটির অপেক্ষায় আছ? আমরা কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে প্রতিক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তাআলা নিজে থেকে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন কিংবা আমাদের হাত দিয়ে।”- তাওবা ৫২

সালাফগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ কর, তাহলে (আমাদের হাতে) হত্যা করানোর মাধ্যমে তিনি আমাদের হাত দিয়ে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন’।

এটিই যথাযথ ব্যাখ্যা। কারণ, তারা যে কুফর তাদের অন্তরে গোপন রাখে, মুমিনদের হাতে তার শাস্তি হত্যার দ্বারাই কেবল হতে পারে। যান্দাকা প্রকাশ হওয়ার পরও যদি এদের তাওবা কবূল হয়, তাহলে মুমিনদের জন্য এটি সম্ভব হবে না যে, তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা এদের শাস্তি দেয়ার প্রতিক্ষায়

থাকবে। কেননা, মুমিনরা যখনই এদেরকে শাস্তি দিতে যাবে, তখনই তারা বাহ্যত মুসলমান হয়ে যাবে। ফলে মুমিনদের হাতে এদের শাস্তি হবে না কখনই। এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ অনেক।”- **ই’লামুল মুআককিয়িন: ৩/১০৭**

ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখন আর সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

বি.দ্র.

যিন্দিক পীর-সূফিদের হত্যা করা জরুরী:

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب [التفرقة بين الإسلام والزندقة] ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان، فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم؛ وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد؛ وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا؛ فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. أما هذا فيزعم

أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اهـ. رد المحتار 4\243

"ইবনে কামাল পাশা রহ. ইমাম গাযালি রহ.-র 'আততাফরিকা বাইনাল ইসলামি ওয়াযযান্দাকা' কিতাব থেকে তার নিজের বক্তব্য বর্ণনা করেন: এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কতক সূফি, যারা দাবি করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন এক সম্পর্কের দরজায় উপনীত হয়েছে, যার ফলে তাদের উপর থেকে নামাযের দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে এবং নেশাজাত দ্রব্য পান করা, গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং সুলতানের মাল ভক্ষণ করা তাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের লোককে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এদের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। এদের দ্বারা (হারামসমূহকে) হালালরূপে গ্রহণ করার এমন এক দরজা খোলবে, যা বন্ধ হবার মতো নয়। যেসব লোক নিঃশর্তভাবে সব কিছুকে হালাল বলে, তাদের চেয়েও এসব লোকের অনিষ্ট বেশি। কেননা, সুস্পষ্ট কুফর হওয়ার কারণে লোকজন নিঃশর্ত হালাল দাবিদারদের কথার দিকে কর্ণপাত করবে না। পক্ষান্তরে এ লোকের দাবি হল, সে শুধু এতটুকু করেছে যে,

শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়-দায়িত্বগুলোকে সে ঐসব লোকের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, যারা (তার দাবি অনুযায়ী) তার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক ফাসেকই দাবি করবে, সে ঐ স্তরে পৌঁছে গেছে।”- **রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩**

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২১

হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি প্রসঙ্গ:

বিশ্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দু’জন যিন্দিক: হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি। এদের দ্বারা ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সংক্ষেপে এ দু’জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য দু’জন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইবনে আরাবি:

ইবনে আবিল ঈজ্ হানাফি রহ. (৭৯২ হি.) ইবনে আরাবির কিছু কুফরি কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

وكيف يخفى كفر من هذا كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا،

وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين : { لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله } ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. اهـ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابى العز الحنفي 492

"যে ব্যক্তি এ ধরণের কথা বলে, সে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কিভাবে অস্পষ্টতা থাকতে পারে?! এ ধরণের কুফরি কথা তার আরোও আছে। সেগুলোর কিছু এমন যে, তার কুফরিটা অস্পষ্ট। আর কিছু আছে সুস্পষ্ট কুফর (যা সকলেই বুঝবে)। এ কারণে সেগুলোর বাতুলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য বিচক্ষণতার সাথে যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, কিছু বাতিল আছে যা সকল যাচাইকারীর সামনেই ধরা পড়ে। আর কিছু আছে যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিদগ্ধ পর্যালোচক ছাড়া

অন্য কারো চোখে ধরা পড়ে না।

ইবনে আরাবি ও তার সমশ্রেণীর লোকদের কুফর (মক্কার) ঐসব (কাফের) লোকদের চেয়েও বেশি, যারা বলেছিল, ‘আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আমাদেরও ঐ জিনিস (অর্থাৎ নবুওয়্যাত) দেয়া হয়, যা আল্লাহর রাসূলদের দেয়া হয়েছিল।’

কিন্তু ইবনে আরাবি ধরণের লোকেরা হচ্ছে ইত্তেহাদি যিন্দিক ও মুনাফিক, যাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরে। মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করে, তাই তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতে হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুনাফিকরা অন্তরে কুফর গোপন রেখে বাহ্যত নিজেদের মুসলমান দাবি করতো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতেন। যদি তাদের কারো থেকে তার লুকানো কুফর প্রকাশ হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করতেন। তবে তার তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত

আছে। সহীহ অভিমত হচ্ছে, কবূল হবে না। মুআল্লা রহ. আবু হানিফা রহ. থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন।”- শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা লি ইবনি আবিল ঈজ: ৪৯২

হাল্লাজ:

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.)-র কাছে হাল্লাজের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন,

من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله. وقوله: إله في السماء وإله في الأرض ...

والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحر وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة: فهو كافر مباح الدم وعلى هذا قتل الحلاج...

وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض: الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك: فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة ... وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا

من العلماء ولا من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمره وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد وهذا أيضا خطأ. وقول القائل: إنه قتل ظلما قول باطل فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين؛ لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه: صار زنديقا فلما أخذ وحبس أظهر التوبة والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا يقبلها. اهـ مجموع الفتاوى 2\480-483

"হাল্লাজ যেসকল (কুফরি) কথা-বার্তায় বিশ্বাসী ছিল, যেগুলোর কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলো বিশ্বাস করবে, মুসলমানদের সকলের ঐক্যমতে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। হুলুল, ইত্তিহাদ এবং যিন্দিক ও মুলহিদদের এ জাতীয় বিভিন্ন কথা-বার্তার কারণে মুসলমানরা তাকে হত্যা করেছে। যেমন, সে বলতো: 'আমিই আল্লাহ', 'আকাশে ইলাহ একজন আর যমিনে ইলাহ আরেকজন (যার দ্বারা সে নিজেকেই উদ্দেশ্য নিতো) ইত্যাদি। ...

হাল্লাজ অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটাত এবং বিভিন্ন প্রকার যাদু-টোনা জানত। যাদু সম্পর্কে তার নামে কিছু কিতাবও

আছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ আকীদা রাখবে যে, তিনি কোন মানুষের ভিতরে অবতরণ করেন এবং তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যান এবং মানুষটি ইলাহ হয়ে যায় এবং সেও (তখন) অনেক ইলাহের মধ্যে একজন ইলাহ: সে ব্যক্তি কাফের এবং তার রক্ত হালাল। হাল্লাজকে এর ভিত্তিতেই হত্যা করা হয়েছে। ...

আর হাল্লাজের ব্যাপারে যা বলা হয় যে, তাকে হত্যা করার সময় তার বেশ কিছু কারামত জাহের হয়েছে; যেমন: তার রক্তের দ্বারা যমিনে আল্লাহ আল্লাহ লেখা উঠেছে, হত্যার কারণে সে খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছে, এছাড়াও এ জাতীয় যত কিছু বলা হয়- তার সবগুলোই মিথ্যা। মুসলিম মনীষীগণ অনেক কিতাবে হাল্লাজের কাহিনি বর্ণনা করেছেন; ... কিন্তু উলামা-মাশায়েখদের কোন একজন ইমামের ব্যাপারেও আমাদের এ কথা জানা নেই যে, তিনি হাল্লাজের ব্যাপারে ভাল কিছু বলেছেন।
তবে হ্যাঁ! কেউ কেউ এ ব্যাপারে (পক্ষ-বিপক্ষ কিছু না বলে) চুপ থেকেছেন। তার কারণ, হাল্লাজের বিষয়টা তাদের জানা ছিল না। তার ব্যাপারে যারা ভাল ধারণা রাখেন, বেশির চেয়ে বেশি তারা এ কথা বলেন যে, জাহিরিভাবে তাকে হত্যা করা

ফরয ছিল; অতএব, যিনি হত্যা করেছেন, তিনি (তাকে হত্যা করার দ্বারা) মুজাহিদ গণ্য হবেন; আর নিহত ব্যক্তিও শহীদ হবে। তবে বাস্তবে এ কথাটিও ভুল।

আর এ কথা বলা যে, তাকে হত্যা করা জুলুম হয়েছে- এটি একটি বাতিল কথা। কেননা, সে যে ইলহাদ (ও কুফর) জাহের করেছে, সে অনুযায়ী আইম্মায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে তাকে হত্যা করা ফরয ছিল। কিন্তু যেহেতু সে বাহ্যত নিজেকে মুসলমান প্রকাশ করত আর তার ভক্তবৃন্দের নিকট গোপনে ইলহাদ জাহের করতো, তাই সে ছিল যিন্দিক। এরপর যখন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছে, তখন বাহ্যত তাওবা করেছে। আর যিন্দিকের তাওবা কবূল করা হবে কি'না এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মত হল, কবূল হবে না।”- মাজমুউল ফতাওয়া ২/৪৮০-৪৮৩

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২২

তিন. বিদআতিদের গুরু

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, যারা যমিনে দ্বীনি বা

দুনিয়াবি কোন ধরণের ফাসাদ ছড়ায়, প্রয়োজনে ফাসাদ দূর করণার্থে তাদের হত্যা করা বা শাস্তি দেয়া বৈধ। আর স্পষ্ট যে, বিদআতিরা দ্বীনের ব্যাপারে ফাসাদ ছড়াচ্ছে। তাদের প্রতিহত করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সহীহ আকীদার সংরক্ষণ করা ফরয। এজন্য প্রয়োজনে বিদআতিদের শাস্তি দেয়ার দরকার পড়লে, গ্রেফতার-বন্দীর দরকার পড়লে তা-ই করতে হবে। যদি কিতাল ছাড়া দমন সম্ভব না হয়, তাহলে কিতাল করা হবে। মুনাসিব মনে হলে তাদের নেতৃত্বস্থানীয়দের হত্যাও করা যাবে। আর যদি বিদআত এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তা কুফর ও ইরতিদাদে পৌঁছে গেছে, তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান আরোপ হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. اهـ مجموع الفتاوى 23\349-350

"কুফর পর্যন্ত না গড়ালেও বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী দাঈকে কখনও হত্যা করা হয় জনসাধারণের উপর থেকে তার

অনিষ্ট প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে; যেমন হত্যা করা হয়ে থাকে মুহারিব(তথা ডাকাত)কে। এমন নয় যে, যাকেই হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল তার রিদ্দাহর কারণেই। এ হিসেবে (কদরিয়া ফিরকার গুরু) গাইলান আলকদরি ও অন্যানদের হত্যা এর ভিত্তিতে হতে পারে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩৪৯-৩৫০

আরো বলেন,

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك. وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض؛ لا لأجل الردة؛ ... وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. اهـ مجموع الفتاوى 28\346-347

“শাফিয়ি, আহমাদ ও অন্যান্য আরো অনেক ইমামের অনুসারিদের এক জামাত কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী বিদআতের দিকে আহ্বানকারী দাঈকে হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন। ইমাম মালেকের অনেক অনুসারিও এর অনুমোদন দিয়েছেন। তারা

বলেন, ইমাম মালেক রহ. সহ আরো অনেকে কদরিয়াদের হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন ফাসাদ ফিল আরদের কারণে; রিদ্দাহর কারণে নয়। ... এর কারণ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আগ্রাসীর অনুরূপ। আর আগ্রাসী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়া বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হয়।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৪৬-৩৪৭

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وفي نور العين عن التمهيد: أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا، وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا ... فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك، فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه، وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا.
والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين. والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما، ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا. اهـ

“‘নূরুল আইন’ কিতাবে ‘আততামহিদ’ কিতাব থেকে বিবৃত হয়েছে: বিদআতিদের বিদআত যদি কুফর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় এবং তারা তাওবা করে ফিরে আসতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের সকলকে হত্যা করে দেয়া বৈধ। যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সকলের তাওবা কবুল করা হবে। ... আর যেসব বিদআত কুফরে গড়ায়নি, সেসবের ক্ষেত্রে তা থেকে বিরত রাখা যায় মতো তা’যির করা আবশ্যক। যদি বন্দী ও প্রহার ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে বন্দী ও প্রহার বৈধ। তদ্রূপ, যদি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে নেতা ও অনুসরণীয় পর্যায়ের বিদআতি হলে সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা বৈধ। বিদআতি যদি লোকজনকে তার বিদআতের প্রতি দাঈ ও আহ্বানকারী হয় এবং তার কারণে বিদআত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে কুফরের ফায়সালা না হলেও সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে সুলতানের জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তার কারণে বড় ধরণের ও ব্যাপক ফাসাদ দেখা দিচ্ছে। কেননা, তার ফাসাদ দ্বীনকে আক্রান্ত করছে। বিদআত যদি কুফরে গড়ায়, তাহলে তাদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা করা হবে। আর কুফর না হলে

দমনের উদ্দেশ্যে তাদের উস্তাদ ও সর্দারকে হত্যা করা হবে।”-রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩

মোটকথা: ইরতিদাদ হলে মুরতাদ হিসেবে সকলকে হত্যা করা হবে। আর ইরতিদাদ না হলে শাস্তি দিয়ে হলেও বিদআত দমন করতে হবে। প্রয়োজনে নেতৃত্বস্থানীয় ও গুরু পর্যায়ের বিদআতিদের হত্যা করাও জায়েয হবে- যদিও তারা কাফের হয়ে যায়নি। বিদআত দমনের জন্য হত্যা করা হবে; মুরতাদ হিসেবে নয়।

বি.দ্র- ১

এখানে বিদআত বলতে সাধারণ বিদআত উদ্দেশ্য নয়; কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট পরিপন্থী বিদআতে গলিজা উদ্দেশ্য। নতুবা অনেক উলামা ফুকাহাকে হত্যা করা আবশ্যক হবে। কারণ, টুকটাক ও সাধারণ কিছু বিদআত অনেক আলেম-ফকিহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। এ ধরণের বিদআত এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে খাওয়ারেজ, *মু’তাজিলা ও কদরিয়াদের মতো

বিদআত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়কার মাজার ও কবর পূজারিদের নেতৃত্বস্থানীয় ভণ্ড বাবাগুলো এ শ্রেণীতে পড়বে। আর দেউয়ান বাগীদের মতো খবীসগুলো তো সুস্পষ্ট মুরতাদ। এদেরকে ফাসাদ ফিল আরদের পাশাপাশি ইরতিদাদের কারণেও হত্যা করা আবশ্যক।

বি.দ্র-২

যেকোন হত্যার ক্ষেত্রেই তার লাভ-ক্ষতির হিসেব করা আবশ্যক। যদি হত্যার দ্বারা লাভের তুলনায় ক্ষতি হয় বেশি, তাহলে হত্যা করা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ারেজদের প্রথম ব্যক্তি যুলখুয়াইসিরাকে এজন্যই হত্যা করেননি। মুনাফিকদেরও ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য বিদআতি কোন গুরু বা বাবাকে হত্যা করতে হলে বিজ্ঞ মুজাহিদ উলামায়ে কেরাম ও উমারাদের নির্দেশনা নিয়ে করা উচিৎ। নয়তো লাভের তুলনায় ক্ষতি হতে পারে বেশি।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৩

চার. পশুর সাথে সঙ্গমকারী

এক হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)

"কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।" - আবু দাউদ: ৪৪৬৬ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

এ হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। কিন্তু তার থেকে এর বিপরীত বর্ণনা আছে। তিনি বলেন,

ليس على الذى يأتى البهيمة حد

"পশুর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তির উপর হদ বর্তাবে না।"- আবু দাউদ: ৪৪৬৭ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

এ থেকে বুঝা যায়, হাদিসে যে হত্যার কথা বলা হয়েছে, তা হদ হিসেবে নয় যে, অবশ্যই হত্যা করতে হবে। বরং তা’যির উদ্দেশ্য। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করা মুনাসিব মনে করেন, তাহলে তা’যিররূপে হত্যা করতে পারেন। আর যদি হত্যা করার দরকার মনে না করেন, তাহলে অন্য শাস্তি দেবেন।

আল্লামা আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

وقيل: إنما قال ذلك في فاعل اعتاد وبذلك قتل سياسة عندنا. اهـ

البناية 6\312

“বলা হয়, হত্যার নির্দেশ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দিয়েছেন, যে এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে।”- আলবিনায়া ৬/৩১২

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৫

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল অনেক দিন হল। মাঝখানে বেশ অনেক দিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে

আলোচনাটা পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আলোচনা চলছিল সিয়াসত ও তা'যিররূপে কাদের হত্যা করা হবে। বেশ অনেকেই এর আওতায় পড়ে। যেমন,

১. যাদুকর।

২. বিদআতিদের গুরু।

৩. যিন্দিক।

৪. সমকামী।

৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গম করে।

৭. চোর।

৮. রাহজান ও ডাকাত।

৯. শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।

১০. ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী।

১১. মদখোর।

১২. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

***

প্রথম পাঁচ জনের আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। আজ ষষ্ঠ জনকে নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ছয়. আপন মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারী

হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

"যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।" - তিরিমিযি: ১৪৬২

যিনার শাস্তি হল অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম করে হত্যা। কিন্তু এ ব্যক্তির বেলায় বিবাহিত অবিবাহিতের কোন পার্থক্য না করে হত্যা করে দিতে বলা

হয়েছে। বুঝা গেল, এর শাস্তি যিনার শাস্তি নয়। তাহলে হত্যা কি হিসেবে? ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

قالوا: جاز فيه أحد الأمرين أنه للاستحلال، أو أمر بذلك سياسة وتعزيرا. اهـ

“উলামাগণ বলেন, এখানে দু’টির কোন একটি হতে পারে: হয়তো হালাল মনে করার কারণে, নয়তো সিয়াসত ও তা’যিররূপে এ আদেশ দিয়েছেন।” –ফাতহুল কাদির ৫/২৬১

অর্থাৎ যদি হালাল মনে করে করে থাকে তাহলে তো মুরতাদ। মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর যদি হালাল মনে না করে থাকে, হারাম জেনেও করে থাকে তাহলে হত্যা করতে বলা হয়েছে সিয়াসতরূপে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে। ওয়াল্লাহু তাআলা আ’লাম।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৬

সাত. চোর

চোরের স্বাভাবিক শাস্তি হল প্রথমবারে চুরি করলে ডান হাত কেটে দেয়া, দ্বিতীয়বারে বাম পা কেটে দেয়া। হাত কাটা কুরআনে কারীম দ্বারা আর পা কাটা সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (দেখুন: ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭-৩৯৮)

তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে কি করা হবে তা মতভেদপূর্ণ। কোনো কোনো জয়িফ হাদিসে তৃতীয়বারে বাম হাত এবং চতুর্থবারে ডান পা কেটে দেয়ার কথা এসেছে এবং পঞ্চমবারে হত্যা করে দেয়ার কথা এসেছে। তবে হাদিস নিতান্তই দুর্বল। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত আমল প্রমাণিত আছে।

যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত যে, দুইবারের বেশি চুরি করলে হাত-পা না কেটে বা হত্যা না করে জেলে ভরে রেখেছেন। এ কারণে হানাফিদের মত হলো, দুইবারের বেশি চুরি করলে জেলে ভরে রাখা হবে এবং শাস্তি দেয়া

হবে। তাওবা করে ভাল হলে তো ভালোই অন্যথায় মরণ পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে। তবে ইমামুল মুসলিমিন বা কাযি সাহেব যদি মুনাসিব মনে করেন তাহলে ফাসাদ ফিল আরদের কারণে তৃতীয়-চতুর্থবারে হাত পা কাটতে পারবেন বা হত্যা করতে পারবেন। তবে প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, দুইবারের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي. اهـ

“হাদিস বর্ণিত হওয়ার পরও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর আমল করেননি। হয়তো এ কারণে যে, চারো হাত-পা কেটে দেয়ার উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল; নয়তো এ কারণে যে, তিনি জানেন, তা শরীয়ত নির্ধারিত হদ হিসেবে নয়, বরং ইমামের রায় হিসেবে। দেখলেন যে, এ লোক ফাসাদ ফিল আরদ করে বেড়াচ্ছে এবং তা থেকে ফিরে আসার মতো

মানসিকতা তার নেই। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয। তাই হতা-পা কেটে দিতে পারেন, যা হত্যারই নামান্তর।” –ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

وفي حاشية السيد أبي السعود: رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه: إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد. اهـ قال الحموي: فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل. اهـ

“সায়্যিদ আবুস সাউদ রহ. তার প্রণীত হাশিয়াতে বলেন, হামাবি রহ. এর নিজ হাতের লেখা দেখেছি যে, (ফাতাওয়া) সিরাজিয়া থেকে নিম্নোক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন: ‘তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর অপরাধে সিয়াসতরূপে ইমামুল মুসলিমিন তাকে হত্যা করতে পারবেন’। হামাবি রহ. বলেন, সিয়াসতের দাবি তুলে আমাদের বর্তমান যামানায় প্রথমবারেই যে হত্যা করে দেয়া হচ্ছে তা অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।” –

রদ্দুল মুহতার ৪/১০৩

অতএব, প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করা যাবে না। তৃতীয়-চতুর্থবারে জেলে ভরে রাখবে। তবে একান্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলে এবং তাকে হত্যা করে দেয়াই সমাজের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে পারবেন।

***

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৭

আট. কিসাস নেই এমন হত্যাকাণ্ড একাধিকবার ঘটালে

কেউ কাউকে হত্যা করলে তা দুই রকম হতে পারে:

এক. হত্যাকারী স্বীকার করেছে যে, হত্যার নিয়তেই আঘাত করেছিল।

এ ধরনের হত্যাকারীকে কিসাসরূপে হত্যা করা হবে, চাই

ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করুক বা লাঠি বা অন্য কোনো সাধারণ বস্তু দ্বারা হত্যা করুক।

দুই. হত্যাকারী হত্যার নিয়তে আঘাত করেছে বলে স্বীকার করছে না। বলছে, আঘাত দ্বারা হত্যা উদ্দেশ্য ছিল না, ঘটনাক্রমে মরে গেছে।

এ ধরনের হত্যাকারীর বিধান মতভেদপূর্ণ। আবু হানিফা রহ. এর মতে এ ধরনের হত্যাকারীর বিধান নির্ভর করে হত্যার সরঞ্জামের উপর। যদি অস্ত্র বা অস্ত্রজাতীয় জিনিস দ্বারা হত্যা করে থাকে, তাহলে কিসাসরূপে তাকেও হত্যা করা হবে। যেমন, তরবারি বা ছুরি দিয়ে হত্যা।

আর যদি বাঁশ-কাঠের লাঠি বা সাধারণ ছোটখাট জিনিস দিয়ে হত্যা করে থাকে, যেগুলো সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহার করা হয় না তাহলে কিসাস আসবে না, দিয়াত দিতে হবে। আর গুনাহ তো আছেই।

এই দ্বিতীয় প্রকারের হত্যা, যেখানে কিসাস আসে না, দিয়াত

আসে- যদি একাধিকবার ঘটায় তাহলে সে মুফসিদ ফিল আরদ। ধৃত হওয়ার পর এ ধরনের লোককেও হত্যা করে দেয়া হবে। প্রথমবার তাকে মাফ করা হয়েছিল এ ভেবে যে, হয়তো সে হত্যার ইচ্ছা করেনি। কেননা, সে যে ধরনের বস্তু দিয়ে আঘাত করেছিল, তা সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহার হয় না। কিন্তু বারবার হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দ্বারা তার আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। এখন আর তাকে মাফ করা হবে না।

রাফিয়ি রহ. (১৩১২হি.) বলেন,

إذا أقر بقصد قتله بما ذكر يقتص منه عنده. اهـ

“ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে স্বীকার করলে আবু হানিফা রহ. এর মতেও তার থেকে কিসাস নেয়া হবে।” –তাকরিরাতুর রাফিয়ি (রদ্দুল মুহতারের সাথে মুদ্রিত, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, কোয়েটা) ১০/১৬০, কিতাবুল জিনায়াত

হাসকাফি রহ. (১০৮৮হি.) বলেন,

لا القود لشبهه ... وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بالخطأ نظرا لآلته إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة اختيار. اهـ

“এ ধরনের হত্যার ফলে (প্রথমত) গুনাহ হবে। (দ্বিতীয়ত) কাফফারা দিতে হবে। (তৃতীয়ত) আকিলাদের উপর দিয়াত বর্তাবে। তবে কিসাস আসবে না। কেননা, হত্যায় ব্যবহৃত বস্তুটির কারণে (হত্যার ইচ্ছা ছিল কি’না তা নিয়ে) কিছুটা সংশয় থেকে যায়। তবে যদি একাধিকবার ঘটায় তাহলে ইমামুল মুসলিমিন সিয়াসতরূপে তাকে হত্যা করে দিতে পারবেন। ‘আলইখতিয়ার’ কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে মূদ্রিত) ৬/৫৩০, কিতাবুল জিনায়াত

সামনে গিয়ে বলেন,

ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر. اهـ

“ধরার পরে তাওবা করলেও মাফ করা হবে না, যেমন যাদুকরকে ধরার পরে মাফ করা হয় না।” –আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে মূদ্রিত) ৬/৫৪৪, কিতাবুল জিনায়াত

উল্লেখ্য: ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যারা অহরহ খুন-খারাবি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করে দেশব্যাপী ফাসাদ করে যাচ্ছে: এরা সকলেই মুফসিদ ফিল আরদ। এরা হত্যার

উপযুক্ত। যারা সরাসরি হত্যা করে তারাও, যারা সহযোগী তারাও। অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে না লাঠি দিয়ে তা দেখার বিষয় নয়। মুফসিদ ফিল আরদের বেলায় অস্ত্র-লাঠির ব্যবধান নেই।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৮

দশ.

যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়

কতক ব্যক্তির অভ্যাস এমন যে, তারা জালেম শাসকদের দরবারে গিয়ে লোকজনের ব্যাপারে বানিয়ে চিনিয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। এদের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে জালেম শাসকরা নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে। এসব লোকও ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও হত্যাযোগ্য। এদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع

{ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: 28]- كما - ضرورة نشاهد. قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ.

“শাইখুল ইসলাম রহ.কে শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীদেরকে এবং জালেমদেরকে বিরতিকালীন সময়ে (হত্যার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।’ এর উপর প্রশ্ন করা হল- বিরতিকালীন সময়ে তো তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং আত্মগোপনে থাকে? তিনি উত্তর দেন: ‘এ বিরত থাকা তো জরুরতের কারণে। যদি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হত, তাহলে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে তারা পুনর্বার তাতেই লিপ্ত হতো। [আনআম: ২৮] যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, শায়খ আবু সুজা রহ.কে আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দেন: একে হত্যা করা বৈধ এবং তার হত্যাকরী সওয়াবের অধিকারী হবে।” -রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪

অন্যত্র বলেন,

وفي البزازية: أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة
ط ملخصا. اهـ

“তাহতাবি রহ. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া থেকে বর্ণনা করেন, ফিতনার সময় জালেমদের সহযোগীদেরকে এবং যারা শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায় মাশায়েখগণ তাদেরকে হত্যা করা জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন।” –রদ্দুল মুহতার ৬/৫৬২

উল্লেখ্য, বিরতিকালীন সময় দ্বারা উদ্দেশ্য- ওয়াল্লাহু আ’লাম- যখন এসব লোক সুবিধা করতে না পেরে আত্মগোপনে থাকে। পরে যখন সুযোগ আসবে আবার ফাসাদ শুরু করবে।

আর ফিতনার সময় দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন মুসলমানদের একক কোনো খলিফা না থাকে। ক্ষমতা নিয়ে নিজেরা মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয় তখন।

মোটকথা, এসব লোককে যখনই পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে। এরা মুফসিদ ফিল আরদ। এদের দ্বারা সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হচ্ছে। জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৯

এগার. বাগি

একজন খলিফা থাকাবস্থায় বা আহলে হল ওয়াল আকদ একজনের হাতে বাইয়াত দিয়ে দেয়ার পর অন্য কেউ খলিফা দাবি করলে হাদিসে তাকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

“তোমরা এক ব্যক্তির (অর্থাৎ এক খলিফার) হাতে ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে আসে বা জামাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।” -মুসলিম: ৪৯০৪

অন্য হাদিসে এসেছে,

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

"যদি দুই খলিফার বাইয়াত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দাও।" -মুসলিম: ৪৯০৫

এ হত্যা তা'যির ও সিয়াসতরূপে। এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা না করলে দলাদলি দেখা দেবে। ফিতনা, মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে। সমাজের সার্বজনীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে একজনকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. اهـ

"হত্যা করা ব্যতীত যার ফাসাদ ও অনিষ্ট দমন হচ্ছে না তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। যেমন, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজে যে (নিজেকে খলিফা দাবি করে) বিভেদ ঘটাতে চায়।" –মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৮-১০৯

এরপর তিনি এর পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল তুলে ধরেন।

বাগিদের ব্যাপারে এখানে কথা বাড়াবো না। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র লেখার ইচ্ছা আছে।